সাহিত্যের স্বরূপ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

আমার পরম শুভার্থী

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্. এ., পি.এইচ-ডি, বি-লিট্

মহাশয়ের

করকমলে

বিনীত—

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

এই লেখকের অন্যান্য বই—

১। বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ (সমালোচনা)—২৲

২। উপমা কালিদাসস্য (প্রবন্ধ)— ১।০

৩। বিদ্রোহিণী (উপন্যাস)— ২৲

৪। এপারে-ওপারে (কাব্যগ্রন্থ)— ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভূমিকা

অধ্যয়ন এবং আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে মনে অনেক কথা জাগিয়াছে; সেই সকল কথাই কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। আমি গ্রন্থমধ্যে বহুবার এই কথা বলিয়াছি যে, সাহিত্যের 'শাশ্বত স্বরূপ' সম্বন্ধে 'শেষ কথা' বলিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্ফল স্পর্ধা। সাহিত্যের স্বরূপ এখনও বিকাশের গতিপথে,—কোথাও গিয়া সে স্থিতি লাভ করে নাই; আর সেই স্থিতিলাভের অর্থ সাহিত্যের মৃত্যু; সুতরাং বিকাশের সুদূরপ্রসারী গতিপথে ছড়াইয়া রহিয়াছে যাহার সমগ্র পরিচয় দেশকালের একটি বিশেষ কোণে বসিয়া তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি 'সনাতন সত্য' আবিষ্কার করিবার স্পৃহা এবং স্পর্ধা আমার নাই। সাহিত্যের গতিপথ অনুসরণ করিতে করিতে আশেপাশে তাকাইয়া যে সকল কথা বিশেষ ভাবে মনকে দোলা দিয়াছে তাহাকেই এইখানে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম।

গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধ ইহার আগে মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; সম্পাদকগণকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাইতেছি। অবশ্য প্রবন্ধগুলির প্রথম

প্রকাশিত রূপের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হইয়াছে। শেষ প্রবন্ধটি আমার 'বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ' গ্রন্থখানির প্রথম প্রবন্ধটির বহুলাংশে পরিবর্জিত, পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত রূপ।

সাহিত্যের আলোচনায় অধ্যাপক রায় শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ., বাহাদুর এবং অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্. এ., পি.এইচ-ডি, ডি-লিট্ মহাশয়ের নিকট হইতে নানা সময়ে নানাভাবে উৎসাহ এবং উপদেশ লাভ করিয়াছি। অধ্যাপক শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্. এ., শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী, এম্. এ., কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায়, ডাঃ শ্রীযুত সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, এম্. এ., পি.এইচ-ডি, শ্রীযুত নরেশচন্দ্র সেন, এম্. এ., বি.এল্ মহাশয়গণও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়া বাধিত করিয়াছেন। আমার পরম প্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীঅমিয়কুমার সেন, এম্. এ., এবং শ্রীমদনমোহন কুমার, এম্. এ-র নিকট হইতে মুদ্রণ-পরীক্ষাকার্যে অনেক সাহায্য পাইয়াছি; তাঁহাদের সহিত আমার ব্যক্তিগত নৈকট্য স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিরত রহিলাম।

২০।১ রসা রোড, কলিকাতা।
১৩৪৯, মাঘ। } গ্রন্থকার

সূচীপত্র

সাহিত্যের প্রাণধর্ম ও তত্ত্ববুদ্ধি

শৈশব-স্মৃতি মনে পড়িতেছে,—মা-দিদিমাদের কথা। তখন পর্যন্তও 'স্টীলট্রাঙ্কে'র প্রচার ছিল না; সাপুড়ে ঝাঁপির মত বেতের ঝাঁপি হইতে বাহির হইত গলায় পরিবার মোটা মোটা সোনার মোহন-মালা, হাতে পরিবার মোটা মোটা অনন্ত এবং বলয়, নাকের নোলক এবং কানের কানবালা। পায়ের 'মল'টা অবশ্য তাঁহারা চাপিয়া যাইতে চাহিতেন লজ্জায়,—বলিতেন, ওটা ছেলেবেলাকার। নাকে নোলক গলায় মোহন-মালা মা-দিদিমাদের দেখিয়া কোন দিন যে সৌন্দর্যবোধে আঘাত-জনিত বেদনায় বিরূপ হইয়া উঠিতাম এমন কথা মনে পড়িতেছে না। অবশ্য আমার সৌন্দর্যবোধও তখন অপগণ্ড ছিল; তথাপি কথাটির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, যে অপগণ্ড সৌন্দর্যবোধ লইয়া আমরা মা-দিদিমাদের ভূষণ-বিরচনকে প্রশংসা না করিলেও অন্ততঃ বরদাস্ত করিতাম, আজিকার দিনের অপগণ্ডরা তাহা করিবে না।

তারপরে একটুখানি ঘুরিয়া আসিল নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান মহাকালের রথচক্র, একটু একটু করিয়া দেখা দিল নূতন আদর্শ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলো-হাওয়া ; তাহার প্রভাবে আমাদের রুচিতে দেখা দিল যে পরিবর্তন তাহাকে আমূল না বলিলেও আপল্লব ত বটেই, আবাহুও বোধ হয় বলা যাইতে পারে। মা-দিদিমা সসম্মানে এবং বিজ্ঞজনোচিত অপ্রতিবাদে তাঁহাদের পেটরাবোঝাই মোটা মোটা অলঙ্কার লইয়া সরিয়া পড়িলেন যবনিকার অন্তরালে,—দৃশ্যপটে আসিয়া দেখা দিলেন এ-যুগের মার্জিতরুচি মহিলাগণ, অঙ্গে অঙ্গে তাঁহাদের জাগিয়া উঠিল 'মুক্তির মন্ত্র'! নোলক হইতে মুক্তি পাইল নাসিকা, কুণ্ডল হইতে মুক্তি পাইল কর্ণ, বলয় হইতে মুক্তি পাইল বাহু। সৌন্দর্যের স্বর্ণরেখা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপ গ্রহণ করিল কণ্ঠে, হাতের কঙ্কণে ফুটিয়া উঠিল সূক্ষ্ম মনের অঙ্কন। মহাকালের এক নিমেষের সহস্রাংশে সেও জাগিল একটা যুগ।

দেখিতে দেখিতে একাল যে আবার কবে কি করিয়া সেকাল হইয়া গিয়াছে, এবং সেকাল আবার রহস্যের স্মিতহাস্যে আসিয়া দেখা দিয়াছে একালের রূপে, তাহা ভাবিয়াই বিস্ময়ে উঠিতেছে মন ভরিয়া। নাকের নোলকটি এখন পর্যন্ত অভিজাত সমাজে ফিরিয়া আসিতে ঈষৎ

ব্রীড়াকুণ্ঠিত হইলেও ঝুলানো কানবালাটি আবার সদর্পে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে স্বর্ণচক্রে। আবার ফিরিয়া আসিতেছে সেই সব গলার মালা, বাহুর অনন্ত,—কঙ্কণে আবার আসিয়া জমা হইতেছে 'প্রাচ্যরীতি-প্রত্যাবর্তনবাদে'র ভার!

মা-দিদিমাদের যুগে যাঁহারা বলিয়ে কইয়ে মহিলা ছিলেন তাঁহাদের সহিত আর জবাবদিহি করিবার সুযোগ নাই; সুতরাং তাঁহাদের ভূষণ-ব্যবহারের পশ্চাতে নিহিত ছিল যে সকল গভীর তত্ত্ব তাহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভেরও সুযোগ নাই; কিন্তু আমাদের চাপল্য এবং জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সকল অপরাধই তাঁহাদের নিকটে সর্বদা মার্জনীয়, এই ভরসায় তাঁহাদের ভূষণ-ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ত্বকথা চালাইয়া দিতে সাহসী হইতেছি। তাঁহাদের অলঙ্কার-ব্যবহারের পশ্চাতে হয়ত যেমন ছিল একটা দৈহিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির চেষ্টা, তেমনিই ছিল একটা আর্থিক ভাবিত্বের পরিচয়। তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সৌন্দর্যের উপকরণগুলি যদি শুধু সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াই থামিয়া না যায়,—তাহার মূল কর্তব্যের অবহেলা না করিয়া সময়ে অসময়ে একটা পুঁজিস্বরূপে সে যদি একটু উপরি কাজ করিয়াই বা লয়, তাহাতেই বা এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল? কিন্তু সৌন্দর্য এবং সাহিত্যের একনিষ্ঠ

পূজারিগণ কিছুতেই এই ব্যভিচার বরদাস্ত করিতে চাহিবেন না; সৌন্দর্য ও সাহিত্যের 'বিশুদ্ধি' রক্ষার্থ তাঁহারা বলিয়া উঠিবেন, এতখানি প্রয়োজন-বুদ্ধির ধূলামলিন দেহ লইয়া আমরা কাহাঁকেও বীণাপাণির মন্দিরে ঢুকিতে দিব না। সুতরাং বিরোধ অবশ্যম্ভাবী!

একালের মার্জিতরুচি মহিলাগণের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। তাঁহাদের ভূষণ-ব্যবহার বিষয়ে তাঁহারা বলিবেন,—অলঙ্কারের স্থূলতা রুচির স্থূলতারই পরিচায়ক; আর সৌন্দর্যবোধের সহিত বাস্তব প্রয়োজনবুদ্ধির যে সম্পর্ক, তাহা শুধু অশ্রদ্ধেয় নয়, অপাংক্তেয়। শক্ত তাঁহাদের কথার বাঁধুনি, শাণিত তাঁহাদের যুক্তির ধার,—অতএব আমাদিগকে তাঁহাদের কথা মানিতেই হইল। কিন্তু সে কথা মানিতে রাজি হইল না দুঃশীল কাল; সমস্ত যুক্তির বহর দূরে ঠেলিয়া দিয়া সে তাই আবার ফিরাইয়া আনিল সেই লম্বা লম্বা কানবালা, আর মোটা মোটা অনন্ত-বলয়। অলঙ্কারের এই নবপরিণত স্থূলতার পশ্চাতে যে আরও কত আধুনিক এবং অত্যাধুনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব রহিয়াছে তাহা এখন পর্যন্ত সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সে বিষয়ে নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। যুক্তির বহরে তত্ত্বের পণ্য ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বে আপাততঃ ইহাকে সেই

'প্রাচ্যরীতি-প্রত্যাবর্তনবাদ' বলিয়াই অভিহিত করিতে পারি।

আসলে কিন্তু এই তত্ত্বকথার দোহাই অনেকখানিই ভুয়া। ভুয়া ঠিক যুক্তির দৌর্বল্যে নহে, ভুয়া এই দিক হইতে যে, যে সৃষ্টির ভিত্তিভূমিরূপে আমরা এই যুক্তিতর্কগুলিকে দাঁড় করাইতে চাই, এই সকল যুক্তিতর্কই যথার্থ সেই সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের মূলীভূত কারণ নহে। বিশেষ বিশেষ যুগের সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত গুরুগম্ভীর তত্ত্বের অবতারণা করিয়া থাকি, তাহাদের ভিতরে সত্য ও তথ্য দুই-ই থাকিতে পারে,—কিন্তু তাহাই যে বিশেষ কোন যুগের রুচি বা প্রচলনের মূল কারণ, এমন কথা স্বীকার্য নহে। যুগের রুচিপরিবর্তন এবং তাহার সঙ্গে সর্বপ্রকার সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং রসসৃষ্টির ভিতরে যে পরিবর্তন ঘটে তাহার কারণ খুঁজিতে আমরা সর্বদাই তত্ত্বের দ্বারস্থ হই, কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া বহিয়া যাইতেছে যে সুদূরপ্রসারী ইতিহাসের বঙ্কিম ধারা সে থাকে অবহেলিত। সেই ঐতিহাসিক নিয়মে যে ক্রম-আবর্তন সে আপনি চলিয়া আসে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে,—তত্ত্ব তাহাকে চালাইয়া লইয়াও যাইতে পারে না,—ইচ্ছা করিলেই যে তাহার গতি রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে এমনও নহে; সেই গতিচ্ছন্দে বিশেষ বিশেষ দেশকালে

ফুটিয়া ওঠে যে বিশেষ বিশেষ রূপ, তত্ত্ব সেই রূপের ব্যাখ্যা মাত্র। কোন বস্তুর 'ব্যাখ্যা'ই তাহার 'প্রাণধর্ম' নহে।

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মমত প্রচলিত আছে তাহাদের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই এই একই সত্য। সাধারণতঃ সভ্যসমাজে প্রচলিত যতগুলি ধর্মপথ আছে তাহাদের পশ্চাতে ততগুলি ধর্মমত আছে। কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখিতে পাইব যে, ধর্মের পথগুলিই জাগিয়াছে আগে, মতগুলি আসিয়াছে সেই পথ ধরিয়া। ঐ মতগুলিকে অবলম্বন করিয়াই যে পথগুলি জাগিয়া উঠিয়াছিল এই প্রচলিত ধারণাটাই অনেকখানি ভুল, বরঞ্চ তাহার উল্টা কথাটাই অধিক সত্য। আজকাল খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে যে সকল গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে এত তত্ত্ব যিশুখ্রীষ্টের মন কোনদিন আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। বৌদ্ধধর্মের ভিতরে যতগুলি 'যান' এবং দার্শনিক 'বাদ' গড়িয়া উঠিয়াছিল, স্বয়ং বুদ্ধদেবের তাহা জানা ছিল কি না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি না। আমাদের উপনিষদের বচনগুলি ঋষিগণ শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত প্রভৃতি তাত্ত্বিক মতগুলির বিশেষ কোন্‌টিকে প্রচার করিতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। আসলে উপনিষদের

ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন উপনিষদের ঋষিগণ, যিশুখ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ,—এবং তাঁহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে মহাকালের আবর্তন—যাহাকে আমরা বলি ইতিহাস।

সাহিত্য এবং সাধারণ আর্টের ক্ষেত্রেও এই এক কথা। আমাদের সাধারণতঃ এই ধারণা যে, বিভিন্ন যুগে আমাদের সাহিত্য এবং কলা সৃষ্টির ভিতরে যে বিশেষ বিশেষ রূপ দেখি, সে রূপগুলি মূলতঃ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব বা মতবাদকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া ওঠে এবং সেই তত্ত্ব বা মতবাদের দ্বারাই তাহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি সর্বদা নিয়ন্ত্রিত। আমরা যখন সাহিত্যের বা অন্য কোন কলা সৃষ্টির ইতিহাস রচনা করিতে যাই, তখন আমরা এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই কাজ করি। কিন্তু আসলে এই তত্ত্বগুলি বা মতবাদগুলিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা আর্টের ক্ষেত্রে বড় কথা নহে। মানুষের মনে সাহিত্য সম্বন্ধে বা অন্যান্য কলাসৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথমে এই কথাগুলি আসিয়াছিল এবং তাহার যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়াই মানুষ সাহিত্য বা আর্টের বিশেষ বিশেষ রূপ দিয়াছিল এ কথা সত্য নহে।

আগে সাহিত্যের সৃষ্টি, পরে সাহিত্যের জিজ্ঞাসা,

তারপরে জাগে মতবাদ। সাহিত্যের আদিম ইতিহাস আলোচনা করিলেই এ কথার যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইবে। আদিম যুগে মানুষের সাহিত্য ছিল, কিন্তু সাহিত্যের মতবাদ ছিল না। সে যুগের সাহিত্যের বিচিত্র রূপ সম্বন্ধে হরেক রকমের মতবাদ গড়িয়া তুলিতেছি এ যুগে আমরা। কিন্তু সেই আদিম যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমানের যত মতবাদের প্রাচুর্য সে বিষয়ে সচেতন না থাকা সত্ত্বেও আদিম যুগে বহু রকমের সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। আদি কবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে বিগলিত হৃদয়ে যখন প্রথম শ্লোক রচনা করেন তখন তিনি জানিতেন না, তিনি কি রচনা করিতেছেন ; রচনার পর তাঁহার মনে বিস্ময় জাগিল,—'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া !' তখন আরম্ভ হইল যুক্তিতর্কের কাজ,—আরম্ভ হইয়া গেল কাব্যের দেহ-মনের বিশ্লেষণ,—আবিষ্কৃত হইল কাব্যতত্ত্ব। (তুং কাব্য-জিজ্ঞাসা, অতুলগুপ্ত, পৃ ২)। শুধু সে যুগের কবি নন,—এ যুগের কবিও বিস্ময়বিমথিত চিত্তে প্রশ্ন করিয়াছেন,—

সে মায়ামূরতি কী কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।

এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

অন্তর্যামী, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ)

কাব্যসৃষ্টির পরে সকল দেশের সকল যুগের সকল কবিরই সেই একই প্রশ্ন,—'কথমেবং রচিতানীত্যেবং বিস্ময়াবহানি।' এই বিস্ময়াবহ এমন সৃষ্টি, তাহা কেমন করিয়া রচনা করিলাম! তারপরেই আরম্ভ হইয়া যায় গবেষণা,— আবিষ্কৃত হয় রাশীকৃত তত্ত্ব এবং মতবাদ।

কলাসৃষ্টি এবং অন্য সর্বপ্রকারের সৃষ্টির সঙ্গে এইখানেই মূলগত তফাৎ যে, অন্যান্য সাধারণ সৃষ্টির বেলায় স্রষ্ট

বস্তুকে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যত তথ্য এবং তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন তিনিই আবার তত বড় স্রষ্টা হইয়া উঠিতে পারেন; কিন্তু সাহিত্য প্রভৃতি কলাসৃষ্টির বেলায় এ নিয়মটিকে খুব বেশী খাটান যায় না। যে কারিগর দশ রকমের নবকৌশলে নির্মিত উড়ো জাহাজ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনি আরও দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সহিত নূতন একখানা গড়িয়া তুলিতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি দশটি ভাল কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ভাল কবিতা বা কাব্য সম্বন্ধে নিখুঁত তথ্য এবং তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন তিনিই যে আর একটি ভাল কবিতা বা কাব্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না। জগতের সাহিত্যসৃষ্টির বা অন্যান্য বিবিধ কলাসৃষ্টির ইতিহাস এবং এ বিষয়ে যত সমালোচনা বা তত্ত্বালোচনা হইয়াছে তাহার ইতিহাস খুঁজিলে দেখিতে পাইব, যাঁহারা সত্যকারের প্রথম শ্রেণীর রূপদক্ষ তাঁহারাই সব সময়ে বড় সমালোচক বা তাত্ত্বিক নহেন; আবার যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সমালোচক বা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ নহেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শ্রেষ্ঠ রূপসৃষ্টি রূপের তত্ত্বজ্ঞানের উপরে মুখ্যতঃ নির্ভর করে না,—সে সৃষ্টিরহস্য নিহিত থাকে তত্ত্বনিরপেক্ষ অন্য কতগুলি কারণের ভিতরে।

আমার মতে সে কারণ মুখ্যতঃ কবি-প্রতিভা এবং ইতিহাস।

আমাদের হৃদয়বৃত্তির রাজ্য হইতে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে আমরা একেবারে নির্বাসিত করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত অভিভাবকত্বের দৌরাত্ম্যকেও স্বীকার করা যায় না। সাহিত্যের সমালোচনা বা সমীক্ষণের নামে আমরা অনেক সময় এমন অনেক তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছাই যেখানে সাহিত্যের রাজ্য পার হইয়া কখন যে আমরা আসিয়া নিছক তত্ত্বের রাজ্যে পৌঁছিয়াছি, আমরা নিজেরাই সে কথা জানিতে পারি না। তখন সাহিত্যের বাস্তব সৃষ্টি-নিরপেক্ষ—ইতিহাস-নিরপেক্ষ তত্ত্বের নিছক আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিই আমাদের কাছে ওঠে বড় হইয়া। বুদ্ধির সেই হিরণ্ময় পাত্রের আবরণে সাহিত্যের সত্য-সূর্য যায় আবৃত হইয়া, স্বর্ণের চাকচিক্য সেখানে বড় হইয়া উঠিতে চায় সত্যের আলো হইতে। বুদ্ধির কাজ বিশ্লেষণ,—সেই বিশ্লেষণ সৃষ্টবস্তুকে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে যত সাহায্য করে, নূতন সৃষ্টি গড়িয়া তুলিতে ততখানি সাহায্য করে না। একজন উদ্ভিদ্‌বিদের ন্যায় আমরা সাহিত্যক্ষেত্রেও আমাদের বৈশ্লেষিক জ্ঞানের উপরে নির্ভর করিয়া যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়া যে যে ফলফুলের আশা করি তাহা

পূর্ণ হইবার পূর্বেই হয়ত দেখিতে পাই, কোন্ সাগরের বিদ্রোহী প্লাবন বহন করিয়া আনিয়াছে অভিনব পলিমাটি,—ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি গিয়াছে বদলাইয়া, আমাদের সহস্র রকমের সযত্ন কর্ষণ এবং সতর্ক বেড়াজালের আয়োজনকে অস্বীকার করিয়া সেখানে জাগিয়া উঠিয়াছে নূতন ফসলের হরিতকান্তি! এই নূতন ক্ষেত্রকে কে গড়িয়া তোলে? কে তাহাতে ছড়াইয়া দেয় নূতন বীজ?—সে ইতিহাস,—মহাকালের লীলা!

আসল কথা, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে সাহিত্যের এবং কলাসৃষ্টির যে বিশেষ রূপ, তাহাদের অস্তিত্বের কারণ তত্ত্বের যৌক্তিকতায় ততখানি নহে, যতখানি ইতিহাসের আবর্তনে। এই যে ইতিহাসের আবর্তন তাহা একেবারেই অন্ধ বা খামখেয়ালী নহে। তাহার অন্তরাবেগের ভিতরেই নিহিত থাকে একটা গভীরতর তত্ত্ব, একটা গভীর সঙ্গতি। বিশ্বসৃষ্টি যেমন কোন মতবাদের দ্বারা গড়িয়া ওঠে নাই, অথচ তাহার প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর ভিতরে নিহিত আছে কত তত্ত্ব, কত যুক্তি এবং সঙ্গতি, একটু ব্যাপক এবং গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্যসৃষ্টিও অনেকখানি সেইরূপই। সাহিত্যক্ষেত্রে বা সাধারণ আর্টের ক্ষেত্রে আমরা যাহাকে তত্ত্বের চাহিদা বলিয়া ভুল করি তাহা অনেক খানিই

ইতিহাসের আবর্তন,—প্রাকৃতিক নিয়মেই যেন গড়িয়া উঠিতেছে নূতন সৃষ্টি ; সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তরাবেগকেই আমি মানুষের ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

'ইতিহাস' শব্দটিকে আমি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি ; সুতরাং এখানে তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বিশ্ব-প্রবাহের যে অন্ধ আবর্তে অরণ্যে বনস্পতির জীবন গড়িয়া উঠিতেছে ঠিক সেই একই প্রবাহে মানুষের জীবন গড়িয়া উঠিতেছে একথা বলিলে অবশ্য মানুষ তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ করিয়া উঠিবে, কারণ সে চেতনশীল বুদ্ধিশালী জীব, তাহার জীবনকে সে অনেকখানি দিতে চায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের গৌরব। এ গৌরব মানুষের অনেকখানি আছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; কিন্তু অহঙ্কারের মোহ ভাঙিয়া গেলে দেখিতে পাই, সেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আমরা যত বড় করিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত, বাস্তবে কিন্তু সে তত বড় নহে। আমরা যাহা, তাহার খানিকটা আমাদের নিজেদের গড়া, আর বাকিটা প্রকৃতির বা বিশ্ব-প্রবাহের দান। এক্ষেত্রে কাহার দান কতটা তাহা কোনো গাণিতিক উপায়ে অংক কষিয়া স্থির করিবার উপায় নাই, কিন্তু আমরা তুচ্ছ করিতে পারি না কোনোটাকেই। আমি যাহাকে প্রকৃতির দান বলিয়াছি তাহা কি ? তাহা

একদিকে যেমন জল-বায়ু, আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত, তেমনি জাতি, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র। আমাদের জীবনের মূলে বেশী কম ইহারা সকলেই বাসা বাঁধিয়া আছে, কাহাকেই আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। এই যে জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বতের কথা বলিলাম, ইহা নিতান্তই গোটা কয়েক 'কাব্যিক' কথা নহে,—আর্য-ভারতের ইতিহাস হইতে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি নদী এবং বিন্ধ্য হিমালয় পর্বত-শ্রেণীকে বাদ দিতে চেষ্টা করা শুধু অসঙ্গত নয়, অসম্ভব। বিরাট হিমালয় পর্বত শুধু পাষাণ-স্তূপের অচলায়তন নহে, ইতিহাসের দৃষ্টিতে সে সচল, কারণ ভারতবর্ষের সমগ্র প্রবাহের ভিতর তাহার দান অনেক। ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন-প্রবাহে হিমালয়ের যে দান সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার অমোঘ প্রভাব কি কেহ অস্বীকার করিতে পারি? সুতরাং শুধু জাতি, ধর্ম বা রাষ্ট্রই আমাদের জীবন গড়িয়া তোলে না, জীবনের উপাদান সংগৃহীত হয় চারিদিক হইতে। ইহাদের সকলকে লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কাল-প্রবাহ,—সেই সমগ্র গতিকেই আমি সংক্ষেপে নাম দিয়াছি ইতিহাস। জীবন সম্বন্ধে একান্তভাবে একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি না লইয়াও একথা বলা চলে যে, আমাদের জীবন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্য প্রভৃতি

সকল কলাসৃষ্টি ছুটিয়া চলে আমাদের এই সমগ্র ইতিহাসের তালে তালে। জীবনের এই সমগ্র ইতিহাসের সহিত আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের যে এই গভীর যোগসূত্র তাহাকে বাদ দিয়া যখন আমরা সাহিত্য বা অন্যান্য সকল আর্টকে দেখিতে চাই একান্ত বিচ্ছিন্নভাবে, তখন আমাদের সে দেখা হয় ভুল এবং অসম্পূর্ণ। তত্ত্ববুদ্ধি বা মতবাদের জোরে এই ইতিহাসের ধারাকে আমরা যেখানে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চাই, সেইখানেই উঠিবে আপত্তি,—শুধু সাহিত্য-স্রষ্টাদের তরফ হইতে নহে, মহাকালের তরফ হইতেও।

কিন্তু এইখানেই প্রশ্ন উঠিবে, মানুষের এক একটি জীবন সে কি শুধু ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের এক একটি বুদ্বুদ্ মাত্র? ইতিহাসই কি শুধু মানুষকে গড়িয়া তোলে, ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতে কি মানুষের কোন হাত নাই? মানুষের ব্যক্তিত্বের তাহা হইলে স্থান কোথায়? প্রবাহের টানেই যদি মানুষের জীবনধারা ছুটিয়া চলে এবং সেই ধারাতেই যদি গড়িয়া ওঠে সাহিত্য এবং অন্যান্য শিল্প-কলা তাহা হইলে প্রতিভার স্থান কোথায়?

আমি ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি সেখানেই বলিয়াছি যে, ইতিহাসের ভিতরে খানিকটা থাকে

প্রকৃতির দান, খানিকটা থাকে আমাদের ব্যক্তিসত্তার দান। জাতি, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি যাহা আমরা জন্মিয়াই লাভ করি উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাকেও আমি প্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর (environment) দান বলিয়া মনে করি; কারণ ইহাদের কাজ যে শুধু আমাদের সচেতন মনের উপরে তাহা নহে, তাহাদের কাজ আমাদের রক্তে—অস্থিতে—মজ্জায়। ইহারাই একত্রে যুক্তি করিয়া আমাদের দেহ-মনকে গড়িয়া তুলিবার ভার লয়, এবং আমরা যাহাকে আমাদের ব্যক্তিত্ব বলি তাহাকে যদি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া দেখা যাইত এবং সেই ভাঙা অংশগুলিকে চিনিয়া লওয়া যাইত তাহা হইলে হয়ত আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং ইতিহাসকে কোথাও পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করিবার সাহস হইত না। গড্ডালিকা-প্রবাহে আমরা যাহারা সাধারণ জীবন-যাত্রায় গা ভাসাইয়া চলি তাহাদের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া চলে, কারণ তাহাদের বেলায় ইতিহাস এবং ব্যক্তি পুরুষের বিরোধ অনুভবযোগ্যই নহে; সুতরাং জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথাই আলোচনা করা যাক্। আমরা একথা বলিতে পারি যে ভগবান্ বুদ্ধ ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দর্শনের ইতিহাসের ধারাকে বদলাইয়া দিয়াছেন। মানুষের

চিরাচরিত চিন্তাপদ্ধতির ভিতরেই তিনি জাগাইয়াছেন একটা বিদ্রোহ। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এ সমস্ত কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু বুদ্ধদেবের হিমাচল-সদৃশ দৃঢ়, বিরাট এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিপুরুষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও বলিতেছি, বুদ্ধদেবই শুধু ইতিহাসকে গড়িয়া গিয়াছেন, ইতিহাস বুদ্ধদেবকে কিছুই গড়িয়া তোলে নাই, একথা স্বীকার করিব না। আমার মনে হয় বেদ-বিধির যে রক্তকলুষ শান-বাঁধান পথে সদম্ভে চলিতেছিল কর্মকাণ্ডে ভরা একটা ধর্মমত, ভারতীয় জনসাধারণের ভিতরে বহুদিন হইতেই তাহার বিরুদ্ধে জাগিতেছিল বিদ্রোহ; উপনিষদ্-গুলির ভিতরেই আমরা শুনিতে পাই সেই বিদ্রোহের একটা সুর ব্রহ্ম-বাদের প্রাধান্য ঘোষণায়, সেই বিদ্রোহেরই অপর একটি সুর রক্তমাংসে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল বুদ্ধদেবের ভিতর দিয়া। রাজসুখে বিলাসমগ্ন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ হঠাৎ জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মৃত লোক দেখিতে পাইয়া সংসার-বিরাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া বেদধর্ম-বিরোধী নবধর্মের প্রবর্তন করিলেন, ইহাই বুদ্ধদেবের যথার্থ জীবন-কথা নহে। তবে এখানে লক্ষণীয় এই যে, তৎকালে ভারতবর্ষে এই বেদধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যাই ছিল বেশী; সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বেদ-বিদ্রোহী

ধারাটি অপেক্ষা বেদবাদী ধারাটিই ছিল প্রবল ; কিন্তু এই যে প্রবল ধারাটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার গতিরোধ করিবার সাহস এবং বীর্য তাহাই ছিল বুদ্ধদেবের ব্যক্তিসত্তার ভিতরে, এইখানেই তাঁহার অনন্যসাধারণতা, এবং এইখানেই মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিতরে আমরা প্রকৃতির দান—ইতিহাসের আবর্তনের অতিরিক্ত আর একটি শক্তিকে মানিতে বাধ্য হই, ইহা মানুষের নিজস্ব-সম্পদ। কিন্তু ইতিহাসের যে ক্ষীণ বিদ্রোহী ধারাটিকে বুদ্ধদেব তাঁহার ব্যক্তিত্বের বীর্য-মহিমায় ছুটাইয়া দিলেন বেদধর্মের এমন প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে, তাহাকেও মানুষের ব্যক্তিত্বের মহিমা আর বেশীদূর টানিয়া লইতে পারিল না, তাহাকেও আবার টানিয়া লইয়া চলিল ইতিহাস, তাই ভারতবর্ষের বৌদ্ধমত ক্রমান্বয়ে উঠিতে লাগিল ঔপনিষদিক মতবাদের অনুরূপ হইয়া, তিব্বতের ইতিহাস তাহাকে গড়িয়া-পিটিয়া লইল লামা-ধর্মরূপে, চীনের ইতিহাস জাপানের ইতিহাস প্রত্যেকেই তাহাকে গড়িয়া লইয়াছে আপনার মত করিয়া।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে কথা খাটে, যিশুখ্রীষ্টের সম্বন্ধে ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের ভিতরে কেহ কেহ যিশুখ্রীষ্টের রক্তমাংসের দেহটির সত্য মানিতেও নারাজ হইতেছেন। তাঁহারা বলেন,

যিশুখ্রীষ্ট বলিয়া কোন কালে কোন লোক ছিলেন না। প্রাচীন ইহুদীধর্মের ভিতরে একটু একটু করিয়া জাগিতেছিল সংস্কারের প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিতরে ইহুদীধর্মকেই পটভূমি করিয়া জাগিতেছিল নূতন বিশ্বাস, নূতন ধর্মমত, এবং একদল ধর্মপ্রচারক প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন সেই নূতন বিশ্বাস ও মত। তৎকালীন সেই সকল ধর্মপ্রচারকের দেহমনের একীভূত মূর্তির যদি কোন কল্পনা করা যায়, তবে যিশুখ্রীষ্ট তাহাই। যিশুখ্রীষ্টের রক্তমাংসের দেহে যে আবির্ভাব তাহাকে মানিয়া লইয়াও বলা চলে যে, উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যিশুখ্রীষ্টের যথার্থ জীবন-কথা। তবে ইতিহাসকে অস্বীকার না করিয়াও ব্যক্তিত্বকে যে স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া দেখা যাইতে পারে, সকল ধর্মপ্রচারক, রাষ্ট্রসংস্কারক এবং সমাজ-ব্যবস্থাপক সম্বন্ধেই সে কথা প্রযোজ্য। যে একান্ত প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যিশুখ্রীষ্ট তাঁহার মত এবং বিশ্বাসকে জীবনের শেষবিন্দু রক্ত দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেই খানেই তাঁহার অনন্যসাধারণত্বের পরিচয়।

আরও একটি দিক দিয়া ইতিহাসের ধারার সহিত ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধটিকে বোঝা যাইতে পারে। ইতিহাস যে সর্বদা অনুকূল স্রোতেই আমাদের ব্যক্তিত্বকে গড়িয়া তোলে

তাহা নহে, মানুষের জীবন-গঠনে তাহার কাজ প্রতিকূল স্রোতেও কম নহে। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হয়, বেদাচারের প্রতিকূল স্রোত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের সংগঠনে কম সাহায্য করে নাই। বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন, বাঙলাদেশে প্রেমধর্ম-প্রচারক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ এক-দিকে যেমন অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তের কামনা, অন্য দিকে তেমন পাষণ্ডীদের প্রাচুর্য। ইহা শুধু ভক্তের কথা নহে, ইহাই যথার্থ ইতিহাসের কথা। আসল কথা এই, মানুষের ব্যক্তিত্ব ইতিহাসকে অনেকখানি ছাপাইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সে ইতিহাস হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নহে। বড় ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর ইতিহাসকে আপনার ভিতরে সংহরণ করিয়া লয়,— ইতিহাসে তাহার দানও হয় বৃহৎ। কিবা ধর্মক্ষেত্রে, কিবা রাষ্ট্রে, কিবা সমাজে এমন কোথাও কোনো দিন এমন ব্যক্তি-পুরুষের আবির্ভাব ঘটে নাই, যাঁহার আবির্ভাব ইতিহাসের সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত নহে। সৃষ্টির ভিতরে কোন বস্তু বা ঘটনাই কখনো একান্তভাবে খাপছাড়া নহে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ এবং কেন্দ্রীভূত করা যাক্। প্রতিভা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারে 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী' মায়াশক্তির ন্যায়। আমাদের

আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্ত এই প্রতিভার সংজ্ঞা দিয়াছেন 'অপূর্ববস্তু-নির্ম্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা', নিত্যই নূতন নূতন সৃষ্টি করিয়া চলিবার যে প্রজ্ঞা তাহাই প্রতিভা। এই প্রতিভা ইতিহাসের দ্বারা কোথাও নিয়ন্ত্রিত এ কথা আমাদের মন কিছুতেই মানিতে চাহে না। কিন্তু ধরা যাক্ বাঙলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় একটা বিরাট প্রতিভার আবির্ভাবের কথা। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে একটি সাহিত্যের যুগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সে কথা আজ আর আমরা কেহই অস্বীকার করি না; সুতরাং বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার দান সর্ববাদিসম্মত কিন্তু ইতিহাসও রবীন্দ্র-প্রতিভাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এ কথা মানিতে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি থাকিলেও না মানিয়া উপায় নাই। পূর্বেই দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার কোন সৃষ্টিই তাঁহার নিজের নহে,—তাঁহার এক 'অন্তর্যামী' তাঁহাকে দিয়া সব সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন। কবি অবশ্য এই 'অন্তর্যামী'কে 'জীবন-দেবতা'র সহিত অভেদ করিয়া তাহাকে একটা আধ্যাত্মিক রূপ দিয়াছেন; কিন্তু অনাধ্যাত্মিকরূপে যদি এই 'অন্তর্যামী'র কোন পরিচয় দিতে হয় তাহা হইলে বলিব, ইহা ইতিহাসের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত কবি-প্রতিভা। কিন্তু কথাটা

আপাততঃ একটু পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়; কারণ প্রতিভাকে আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি 'অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা'; ইতিহাসের সহিত তাহার নিবিড় যোগের তাৎপর্য কি? এইখানে মনে রাখিতে হইবে,—প্রতিভা যে অপূর্ববস্তু নির্মাণ করে তাহার মাল-মশলা সে সংগ্রহ করিয়া লয় অনেকখানি পূর্ববস্তু হইতে, ইতিহাস হইতে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া সংগৃহীত হয় এই সকল মাল-মশলা,—এইখানেই ইতিহাসের সহিত প্রতিভার গভীর যোগ।

ইতিহাস যে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভাকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে পরিমাণে কাব্য-কবিতা লিখিয়াছেন তাহার মোট পরিমাণ অন্ততঃ পাঁচখানি বাল্মীকি-রামায়ণের সমান হইলেও তাঁহার দীর্ঘতম কাব্যজীবনে তিনি একখানিও 'মহাকাব্য' লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। সাহিত্য হিসাবে মহাকাব্যের উপরে তাঁহার যে কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহার প্রমাণ পাইয়াছি আমরা তাঁহার লেখার ভিতরে; ব্যাস-বাল্মীকির প্রতি ছিল তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা; কিন্তু তথাপি তিনি একখানিও মহাকাব্য লিখিয়া যান নাই, লিখিতে চেষ্টাও করেন নাই। এখানে ইতিহাস টানিয়া ধরিয়াছিল

দৃঢ়হস্তে তাঁহার প্রতিভার রাশ,—সে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিল,—এই বিংশ শতাব্দীতে আমি রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায়, এমন কি 'প্যারাডাইজ্-লষ্ট্' বা 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের ন্যায় কাব্যকেও রচিত হইতে দিব না;—অমোঘ সেই ইতিহাসের শাসন! রবীন্দ্রনাথ বহু নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন বটে, কিন্তু সেক্সপিয়ার যে জাতীয় নাটক লিখিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সে জাতীয় নাটক একখানাও রচনা করেন নাই। ইহা যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অক্ষমতা তাহা নহে, ইহা ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণ।

আমি পূর্বে যে কথাটি বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এই যে, সাহিত্য প্রধানতঃ প্রাণের ক্ষেত্র—হৃদয়ের ক্ষেত্র,—বুদ্ধির ক্ষেত্র নহে। তথাপি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধির সাহায্যে আমরা গড়িয়া তুলিতেছি হাজার রকমের নিত্য নূতন মতবাদ। এই মতবাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই, তাহাদের প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধাও নাই, কাব্যকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাহাদের আলোচনার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু আমার আপত্তি সেইখানে যেখানে এই মতবাদের বেড়াজাল রচনা করিয়াই আমরা নিজেদের সকল সৃষ্টির জন্য

আত্মপক্ষ-সমর্থনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাই ; শুধু তাহাই নহে, যুক্তিতর্কের বলেই সদম্ভে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করি আমাদের সৃষ্টির প্রাধান্য এবং তাহারই তুলনায় অন্য সকল সৃষ্টির অকিঞ্চিৎকরতা। কিন্তু এই যত্নে-গ্রথিত মতবাদের দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের দৌর্বল্য ধরা পড়ে তখনই যখন আমরা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাই। আমাদের মতবাদের বনিয়াদ যতই সুদৃঢ় হোক, ইতিহাস যে সর্বদা তাহার শাসনই মানিয়া চলে—এ কথা বলে চলে না ; সে চলে তাহার সতেজ প্রাণধর্মে। যেখানেই মতবাদের দ্বারা আমরা একেবারে চারিদিক হইতে আঁটিয়া বাঁধিতে যাইব ইতিহাসের ধারাকে, সেখানেই তাহার ধারা যাইবে থামিয়া, জমিয়া উঠিবে অক্ষম-সৃষ্টির আবর্জনার স্তূপ।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তর্কের সুবিধার জন্য আমরা কতগুলি গালভরা 'ইজম্' বা 'বাদ' তৈয়ারি করিয়া লইয়াছি; যেমন 'আদর্শবাদ', 'রোম্যান্টিক্‌বাদ', 'বাস্তববাদ' প্রভৃতি এবং সুযোগ সুবিধামত ইহাদের একটিকে অপরের পিছনে লাগাইয়া বেশ একটা ঘোলাটে পাক সৃষ্টি করিয়া লই। কিন্তু রোম্যান্টিক্ মতবাদকে ক্ল্যাসিক্‌বাদ অথবা বাস্তববাদের পিছনে যতই লাগাইতে চেষ্টা করি না কেন, আসলে

তাহাদের ভিতরে কিন্তু কোনও বিরোধ নাই; কারণ, তাহারা যে যাহার যুগে, যে যাহার ক্ষেত্রে আপন মনে চলিয়া যায় তাহাদের স্বচ্ছন্দ গতিতে। তর্কযুদ্ধের দ্বারা যতই জয় পরাজয় লাভ হউক তাহা দ্বারা তাঁহাদের গতি রুদ্ধও হয় না, নিয়ন্ত্রিতও হয় না।

হোমারের যুগে তিনি এপিক্ লিখিয়া ভাল করিয়াছেন না হেলেনকে অবলম্বন করিয়া রোম্যান্টিক্ প্রেম-গীতিকা লিখিলে ভাল করিতেন এ প্রশ্ন যেমন হাস্যকর, সাহিত্যের ক্ল্যাসিক্‌বাদ ভাল না রোম্যান্টিক্‌বাদ ভাল এ প্রশ্নও তেমনি হাস্যকর। বেদব্যাস মহাভারত লিখিয়া ভাল করিয়াছেন, না রবীন্দ্রনাথ লিরিক্ কবিতা লিখিয়া ভাল করিয়াছেন— সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমনতর অবান্তর প্রশ্নের কল্পনা করা যায় না। অথচ মজা এই যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্যিক সমালোচনার নামে আমরা এই জাতীয় অবান্তর প্রশ্ন লইয়াই মাতিয়া থাকি বহু সময়। ব্যক্তি-প্রধান লিরিক্ কবিতা যতই ভাল হোক, বেদব্যাসের যুগে সে সাহিত্যের সত্য ছিল না, প্রমাণ—ইতিহাস; আবার এপিক্ কাব্য যতই ভাল হোক না কেন বিংশ শতাব্দীতে সে অচল, তাহার প্রমাণও ইতিহাস, কারণও ইতিহাস। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি-প্রধান গীতি-কবিতা যতখানি সত্য,

হোমার, বাল্মীকি ও ব্যাসের যুগে আবার মহাকাব্যও ততখানি সত্য। এখানে ভাল-মন্দের কোন প্রশ্নই আসে না, আসল প্রশ্ন সত্যাসত্যের, এবং সে সত্যাসত্য নির্ধারণ করে যুগের ইতিহাস। শিল্পের ক্ষেত্রে মিশরের পিরামিড বড় না আগ্রার তাজমহল বড়—এ কথা শুধু অবান্তর নহে, একান্ত অরসিকোচিত।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্যের কাব্যত্বলক্ষণ সম্বন্ধে বহু রকমের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই আলোচনার সহিত আমাদের যতই পরিচয় ঘটে ততই তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতি এবং যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়ি। কিন্তু এই আলঙ্কারিকগণের ভিতরেই দেখিতে পাই, কেহ কেহ বলিয়াছেন 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'; অর্থাৎ অলঙ্কারের জন্যই কাব্য সুধী সমাজে গৃহীত হয়; কাহারও মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'—রীতিই কাব্যের আত্মা;—কেহ বলেন 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্',—অর্থাৎ বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ;—কেহ বলেন, 'অনলঙ্কৃত হইলেও অদোষ এবং সগুণ শব্দার্থই কাব্যের প্রাণ'; কেহ কেহ বলিয়াছেন কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে তাহার 'ঔচিত্যে'র উপরে। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে এই সকল মতবাদের সহিত বর্তমানকালে আমাদের মনের যোগ নাই,—এবং

এই সকল কাব্য-লক্ষণকারগণের সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, সাহিত্য সম্বন্ধে ইহাদের কথা অনেক স্থলেই —'এহো বাহ্য',—কোথাও কোথাও বা 'এহো হয়',—কিন্তু 'আগে কহ আর'। অবশ্য এই সকল প্রাচীন মতবাদগুলিকে তাহাদের একান্ত উপর-উপর অর্থে গ্রহণ না করিয়া যদি তাহাদের অন্তর্নিহিত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের অভিযোগের মাত্রা একটু কমিতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের মনের প্রসন্ন সম্মতি তাহাতেও পাওয়া যাইবে না। না পাওয়াই ত স্বাভাবিক। কারণ যে যুগের আলঙ্কারিক যে সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' সেই যুগ এবং তাহার সাহিত্য এবং আমাদের এই বিংশ শতাব্দী এবং তাহার সাহিত্য ইহাদের ভিতরেই যে রহিয়াছে ঘোর ব্যবধান। ঐ কাব্য-লক্ষণটির বিচার করিবার সময়ে আমরা যদি সেই যুগ এবং তাহাতে সৃষ্ট কাব্যগুলির কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই, তবে তাঁহাদের উপরে করিব অবিচার। যে যুগের কবিগণ কাব্যের প্রারম্ভে বা শেষে পাঠকবর্গকে ডাকিয়া বলিতেন,—'যদি কাব্যের পদে পদে শ্লেষালঙ্কার পাইতে চাও ত আমার কাছে আস',—কেহ বলিতেন, 'পদে পদে যমক পাইতে হইলে আমার কাব্য পড়,' কেহ বলিতেন,—'পদে পদে

অনুপ্রাস পাইতে হইলে আমার নিকটে আস',— সে যুগের কাব্য-বিচারক যদি বলিয়া থাকেন যে 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' তবে তিনি খুব ভুল কথা বলেন নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যের ভিতরে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, এমন অনেক কাব্য রহিয়াছে, মনোহর বচন-বিন্যাস, অপূর্ব বাক্-চাতুর্যই তাহাকে কাব্যপদবাচ্য করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই বলিতে-ছিলাম যে, প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের কাব্য-বিচার পদ্ধতিকে আজ যদি আমাদের কাব্যে আমরা হুবহু লাগাইতে না ই পারি, তাহা দ্বারাই তাঁহাদের যুক্তি এবং মতবাদের যাথার্থ্য অস্বীকৃত হয় না; তাঁহারা যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন ইতিহাস তাহার সত্যতার প্রমাণ দিবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে পারি। কিছু দিন পূর্বেও আমরা বলিতাম,—'ধ্বনিই কাব্যের আত্মা' বা 'বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ', কাব্যের স্বরূপ-বিচারে এসকল নিতান্তই বাহ্য কথা; অথবা আমরা বলিতাম,'ধ্বনি'র আত্মা বা 'বক্রোক্তি'র আত্মা লইয়া গড়িয়া ওঠে যে কাব্য তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বহুদিন হয়,—সাহিত্যের ইতিহাসে সেই 'জাতি'টিই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। স্মিতহাস্যে অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িল মহাকাল,—তাই এই বিংশ শতাব্দীতে আবার দেখিতেছি আবির্ভাব ঘটিয়াছে 'ধ্বনিবাদ' আর 'বক্রোক্তিবাদে'র। যে

'রসবাদ' এতদিন ধরিয়া আমাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল, একটু একটু করিয়া আবার ঘটিতেছে তাহার তিরোভাব। অত্যাধুনিক যুগের বড় বড় কবিদের ভাল ভাল কবিতার যদি একটা বাছাই করা যায় তবে দেখিতে পাইব যে তাহার অনেকগুলি কবিতাই কবিতা হইয়া উঠিয়াছে শুধু 'ধ্বনিবাদে' বা 'বক্রোক্তিবাদে।' অনেক কবিতার ভিতরেই পাওয়া যায় শুধু একটা ধ্বনি, সে ধ্বনিও রসধ্বনি নয়, একান্তই অর্থধ্বনি, যাহাকে মুখ্যতঃ গ্রহণ করিতে হয় হৃদয় দিয়া নহে,—মাথা দিয়া। আর শুধু মাত্র 'বক্রোক্তি' দ্বারাই কতগুলি বাক্য সমষ্টি যে একটি কবিতা হইয়া উঠিয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলেও অত্যাধুনিক কবিতার ভিতরে খোঁজাখুঁজির দরকার হয় না। সুতরাং অত্যাধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কোন মতবাদ সৃষ্টি করিতে গিয়াও হয়ত কেহ বলিতে পারেন, 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ',—অথবা 'বক্রোক্তিঃ কাব্য-জীবিতম্।' নিছক বাগ্-বৈদগ্ধ্যও যে কাব্যের কাব্যত্ব লক্ষণের ভিতরে কতখানি প্রধান হইয়া উঠিতে পারে তাহা বুঝিতে আজ আমাদিগকে আর প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের দ্বারস্থ হইতে হয় না, আধুনিক কাব্যে তাহার সন্ধান মিলিবে অপর্যাপ্ত।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন,—"কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান তাঁহাকে ভুলিতে হইবে, যে, আপিসের বেলা হইতেছে; মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরস-বিলাসী রাজ্যেশ্বরবিশেষ, রাজসভা মধ্যে সমাসীন এবং "সমানবয়োবিদ্যালঙ্কারৈঃ অখিলকলাকলাপালোচনকঠোর-মতিভিঃ অতিপ্রগল্‌ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈঃ কাব্য-নাটকাখ্যানাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ বিনয়-ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ।" এই যুগ-ইতিহাসই 'কাদম্বরীকাব্যে'র জন্ম ইতিহাস। আমাদের এই আপিসওয়ালা 'যুধ্যমান ঘর্মসিক্ত' বিংশ শতাব্দীতে 'কাদম্বরীকাব্যে'র পুনরাবির্ভাবকে আর সাহিত্যিক ব্যবস্থাপক-পরিষদের প্রণীত আইনের দ্বারা বন্ধ করিতে হয় না,—তাহার পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারী করিয়া রাখিয়াছে কাল। কোন প্রতিভা ইচ্ছা করিয়াও আজ আর 'বাসবদত্তা' বা 'হর্ষচরিতে'র ন্যায় সাহিত্য রচনা করিতে পারিবে না। আর এই আপিসওয়ালা 'যুধ্যমান ঘর্মসিক্ত' যুগে গড়িয়া উঠিতেছে যে শত সহস্র আপিস-মার্কা উপন্যাস, 'কাদম্বরী'র যুগে যদি আমরা পাইতে চাই তাহাদিগকে, তাহা হইলে নিরাশ হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। মনটিকে একবার শূদ্রকরাজার যুগে এবং তাহার রাজ্যে

পাঠাইয়া দিতে পারিলে 'কাদম্বরী' কাব্যকে অপূর্ব কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনও কুণ্ঠা আসে না ; কিন্তু নৈষ্ঠিক মার্ক্সপন্থী রাজ্যের চতুঃসীমানার ভিতরে বিশুদ্ধতম বুর্জোয়া-গন্ধী 'কাদম্বরী'র প্রবেশ-অধিকার লইয়াই হয়ত তীব্র মতবিরোধ দেখা দিবে। অন্যদিকে আবার আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর সদ্যঃপ্রকাশিত একখানি প্রগতিমার্কা উপন্যাস বা কবিতাগ্রন্থ বগলে করিয়া কাহারও শূদ্রক রাজার মণিকুট্টিমে প্রবেশ করিবার কথা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন !

বলিতেছিলাম সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরস্পর বিবদমান বিভিন্ন মতবাদের কথা,—এই জাতীয় সাহিত্যই রচিত হওয়া উচিত, এই জাতীয় সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত নহে, এই বলিয়া আমরা নিরন্তর যে যুক্তির ফতোয়া বাহির করিতেছি তাহারই কথা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিতর্কটি সবচেয়ে জমকালো হইয়া ওঠে তাহা আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদের ঝগড়া। অবশ্য এই আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের ভিতরে যে কোথায় একটি স্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া এই ঝগড়াটিকে দাঁড় করান হয়, তাহা সব সময় বুঝিয়া ওঠা শক্ত। বহির্বস্তুর মনোময় রূপের অতিরিক্ত একটি যথাস্থিত রূপ যে মন কি করিয়া গ্রহণ করিয়া সাহিত্যে রূপায়িত করিয়া তোলে

তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায় না। তথাপি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের কথা বলা হয় তাহাকে সাধারণ ভাবে মানিয়া লওয়া যাক। সেখানেও আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদর্শবাদও যেমন একক সত্য নহে, বাস্তববাদও তেমনি একক সত্য নহে। সাহিত্যকে আদর্শবাদী হওয়া উচিত ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারা যদি ভুল বলেন, তবে সাহিত্যকে বাস্তববাদীই হওয়া উচিত একথা যাঁহারা বলেন তাহারাও তেমনিতর ভুলই বলেন। সাহিত্যের কি হওয়া উচিত ও কি না হওয়া উচিত একথা লইয়া বুদ্ধিকে যত ইচ্ছা শাণানো যাইতে পারে,—কিন্তু ঔচিত্য অনৌচিত্য একবার নির্ধারিত করিয়া দিতে পারিলেই সাহিত্য যে চিরন্তন কালের জন্য সেই ফতোয়া মানিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিবে এ কথা আমাদের ভাববিলাস মাত্র। সাহিত্য কি ও সাহিত্য কি না,—তাহার কোন্ পথে চলা উচিত, কোন্ পথে না চলা উচিত—এ-বিষয়ে স্মার্ত শাসনের নিয়মাবলী যতই স্তূপীকৃত হোক, সাহিত্য চিরবিদ্রোহী—সে চলে তাহার আপন খুশীতে, আপন প্রাণ-স্পন্দনে। সেই স্বচ্ছন্দ প্রাণ-প্রবাহেই সত্য হইয়া ওঠে তাহার আদর্শবাদ, মিথ্যা হয় তাহার বাস্তববাদ; আবার সেই গতি-প্রবাহেই মিথ্যা হইয়া যায় তাহার আদর্শবাদ, সত্য হইয়া ওঠে তাহার

বাস্তববাদের রূপ। এই যে প্রাণ-স্পন্দনের গতি—বুদ্ধির অনুশাসন তাহাকে কতটুকু মানাইয়া চলিতে পারে ?

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে যে আদর্শবাদের প্রাধান্য তাহা তৎকালীন যুগধর্মের পরিচায়ক। মানুষের খাঁটি জীবনকে দেখিবার ক্ষমতা যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, একথা সহজেই মানিতে প্রস্তুত নই। সে দৃষ্টি না থাকিলে বঙ্কিম-সাহিত্যের কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, রোহিণী প্রভৃতিকে পাইতেই পারিতাম না। কিন্তু তাঁহার কবিধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল যুগধর্ম; তাই তিনি কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া সূর্য-মুখীকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; শৈবলিনীকে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের আগুনে পোড়াইয়া ঘরে ফিরাইয়াছিলেন, রোহিণীকে গুলী করিয়া মারিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের আদর্শবাদের পক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করুন না কেন, তাহাতে শরৎ-সাহিত্য অস্বীকৃত হয় নাই। আবার শরৎচন্দ্র সাহিত্যের বাস্তববাদের পক্ষে যতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে করিয়া একথা মনে করা একান্ত ভুল হইবে যে, সাহিত্যের আদর্শবাদের মূলে সেইখানেই একেবারে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। সৃষ্টির রাজপথে চলিয়াছে কালের রথচক্রের আবর্তন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌছিতে না পৌছিতেই চারিদিক

হইতে রব উঠিয়াছে—শরৎচন্দ্র প্রচ্ছন্ন আদর্শবাদী, বাস্তব-বাদের মুখোসটি খুলিয়া ফেলিলেই তাঁহার উগ্র আদর্শবাদের স্বরূপটি আমাদের কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শরৎ-সাহিত্যেও তাই আধুনিক বাস্তবপন্থীদের চাহিদা ষোল আনা মিটাইতে পারিতেছে না। ইতিমধ্যে বছর পনের পূর্বে শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই জাঁকিয়া উঠিয়াছিল একটা বেপরোয়া বাস্তববাদের তাণ্ডব ; শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু যুক্তি-তর্ক-সমন্বিত সদুপদেশ দিয়া ইহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "থামো, থামো।" কিন্তু কে শোনে সেই কথা, কে আর থামে,—"এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?" শুধুই কি যৌবন-জলতরঙ্গ ? সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়া উঠিতে লাগিল কত মতবাদ—যুক্তিতর্ক, চলিতে লাগিল মসীযুদ্ধ—প্রায় প্রমাণিত হইয়া গেল যে, ঐ বেপরোয়া বাস্তববাদই সাহিত্যের আসল ধর্ম—একেবারে টাটকা খাঁটি রূপ। আসল কথা কিন্তু তাহা নহে—আসল কথা ঐ জলতরঙ্গ—আমাদের যৌবন-জলতরঙ্গ নহে—বিদেশাগত জলতরঙ্গ, যাহাতে আমাদের যৌবনকে দিয়াছিলাম ভাসাইয়া। কিন্তু যে তরঙ্গকে যুক্তি-তর্কের বাঁধ দিয়া থামান গেল না—তাহাকে থামাইয়া দিল আর একটি তরঙ্গ, সে তরঙ্গ উঠিয়াছিল আমাদেরই পরিচিত গাঙের কূল হইতে। হঠাৎ

কয়েকখানি উপন্যাস গড়িয়া উঠিল নিছক আমাদের ঘরের কথায় আমাদের ঘরের জীবন লইয়া। তাহার ভিতরে আমরা স্পর্শ পাইলাম আমাদের বাঙলা দেশের জলমাটি আকাশ-বাতাসের ভিতরে খাঁটি বাঙালী জীবনের, আমরা বলিয়া উঠিলাম,—"হ্যাঁ, খাঁটি উপন্যাস-সাহিত্য বটে!" সঙ্গে সঙ্গে অমনি জমিয়া উঠিতে লাগিল মতবাদের ভিড়। আমরা বলিয়া উঠিলাম, যে সাহিত্যের সহিত আমাদের অন্তরঙ্গ যোগ নাই—নাড়ীর টান নাই—যাহার ভিতরে বাঙলার ভিজামাটির গন্ধ নাই, তাহা উপন্যাস নহে—পরগাছা, জঞ্জাল। কিন্তু একথা হলফ করিয়া বলা যায় না যে, আধুনিক কালে যাঁহারা এই জাতীয় উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সাহিত্য রচনার পূর্বে নিশ্চয়ই এই মতবাদটির দ্বারা 'চাঙ্গা' হইয়া উঠিয়া কলম ধরিয়াছিলেন,—তাহাদের রচনার প্রেরণা আনিয়াছিল প্রাণধর্মের গতিবেগ। বাস্তববাদী পরগাছা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আমাদের মনের ভিতরে হয়ত জাগিয়া উঠিতেছিল একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া, ভিতরে ভিতরে চাহিতেছিলাম পরিবর্তন; সেই চাহিদা সাহিত্যের প্রাণ-প্রবাহে দিয়াছিল নূতন দোলা, সৃষ্টি হইল নূতন সাহিত্যের। কিন্তু এইখানেই আবার সাহিত্যের সনাতন রূপটি আবিষ্কার করিয়াছি, এমন কথা যেন মুহূর্তের

জন্যও মনে স্থান না দেই ; কারণ যতদিনে ইহার খাঁটিত্ব ও সনাতনত্ব সম্বন্ধে যুক্তির বহর দাঁড় করাইব, ততদিনে হয় ত বাহিরে তাকাইয়া দেখিব রাজপথে জাঁকিয়া উঠিয়াছে নূতন শোভাযাত্রার হর্ষধ্বনি !

সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কথা সত্য, আকৃতি সম্বন্ধেও সেই কথা সত্য। বাঙলা-সাহিত্য হইতেই উদাহরণ লওয়া যাক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধুসূদন দত্ত বাঙলা-সাহিত্যে আনিয়াছিলেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ, কাব্য-সাহিত্যে সে বিদ্রোহ রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনে। বহু প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদীর একটানা স্রোতে বাঙালীর প্রাণ ক্রমেই ঝিমাইয়া পড়িতেছিল,—কাব্য-জীবনে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল একটা তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রচণ্ড ধাক্কার যাহাতে সচকিত হইয়া ওঠে বাঙালীর দেহ-মন ; সেই ধাক্কা আসিয়াছিল বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের কাছ হইতে। বাঙালীর রক্ষণশীল বনিয়াদে অনুভূত হইল যে প্রবল কম্পন তাহার প্রতিক্রিয়াও কম হয় নাই ; মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র বিদ্রূপে লিখিত হইল 'ছুছুন্দরী-বধ কাব্য',—কিঞ্চিদর্থক এবং অনর্থক কোলাহলে চেষ্টা হইল অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিটিকে ডুবাইয়া দিতে ; কিন্তু কোন

প্রচেষ্টাই ফলবতী হয় নাই,—কারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দ আসিয়াছিল গভীর প্রয়োজনে,—সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনই ছিল তাহার অস্তিত্বের দৃঢ় বনিয়াদ। শত বাধা সত্ত্বেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাই বাংলা-সাহিত্যে চলিয়া গেল ; এমন কি কিছুদিন পর্যন্ত বাঙলা-সাহিত্যে তাহা চলিয়াছিল প্রায় যেন অন্ধ-আবেগে। কাব্যের দেহে যেমন আসিল সবল বাহুর আস্ফালন,—প্রাণেও আসিয়াছিল তাহারই উপযুক্ত শৌর্য-বীর্য।

কিন্তু কিছুদিন পরেই আবির্ভাব হইল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ; স্বর্গমর্ত্ত্য প্রকম্পিত করিয়া যে রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল দিকে দিকে, তাহারই একপাশে একান্ত নিভৃতে নিজের মনো-বীণার সূক্ষ্ম তারে করুণ-মধুর ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিলেন বিহারীলাল। কে বিচার করিবে, বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টি বড় না বিহারীলালের ? এ তুলনাই আসে না,—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই উভয়ই সত্য। মিত্রাক্ষরের বাঁধ ভাঙিয়া উন্মাদ গতিতে যে কাব্য-প্রাণ ও যে ছন্দ পত্তন করিয়াছিল বাঙলা-সাহিত্যে একটি 'বীরযুগে'র, সেই যুগের পক্ষে সে একটা বড় সত্য,—তাহার ভিতরে সাহিত্যের কোন সনাতন রূপ খুঁজিতে গেলেই ভুল করিব। মধুসূদনের মাত্রাজ্ঞান ছিল ; তাই

তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'খানি 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র ভাষায় বা ছন্দে রচনা করিবার কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন বাঙলা-সাহিত্যে যে ধারাটির প্রবর্তন করিয়াছিলেন বাঙলার 'কোমলকান্ত পদাবলী'র কাব্য-নিকুঞ্জে তাহা আনিয়াছিল একটি পৌরুষ সরসতা,—কিছুদিন তাই চলিল তাহারই ধাক্কা। কিন্তু সেই পৌরুষ-নিনাদ কিছু দূরে গিয়াই অন্ধ অনুকারকদের হাতে পর্যবসিত হইয়াছিল একটা কৃচ্ছ হাঁপানিতে; কাব্যের মোড় আপনা হইতেই ফিরিয়া গেল,—আসিল বিহারীলালের নিভৃতে আপন মনে কাব্য-কূজন, আসিল বাঙলা-সাহিত্যে সত্যকারের রোম্যান্টিক্ লিরিক্ কবিতার যুগ এবং সে ধারা তাহার পরিপূর্ণতা লাভ করিল রবীন্দ্রনাথের হাতে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা-সাহিত্যকে কি দিলেন, না দিলেন, তাহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; আমরা শুধু জানি যে দু'হাত ভরিয়া এত পাইলাম—এমন সুকুমার এবং বহু বিচিত্র তাহার রূপ—এমন মধুর তাহার আস্বাদন যে আমরা শুধু মাতালের মত নেশায় জমিয়া উঠিলাম,—সেই রসমাধুর্যের ভিতরে ভুলিয়া গেলাম কালের আবর্তন। মনে করিলাম—রবীন্দ্রনাথের সুর শুনিয়া চঞ্চলা কাব্য-লক্ষ্মী বুঝি অচঞ্চলা

রূপ গ্রহণ করিলেন,—কাব্যের চরম প্রকাশ বুঝি এইখানেই। কিন্তু কালের রথচক্রও থামিল না, নৃত্যচপলা কাব্য-লক্ষ্মীও থামিলেন না,—আসিল 'রবীন্দ্রোত্তর যুগ',—এবং সে যুগেরও পত্তন করিলেন কতকখানি রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা কাব্য-কবিতার রূপ অনেকখানিই গিয়াছে বদলাইয়া। আবার আসিয়াছে পশ্চিম হইতে নূতন 'জল-তরঙ্গ',—আবার তাহাতে দিয়াছি আমরা আমাদের যৌবন ভাসাইয়া। কাব্যে রোম্যান্টিক্‌বাদ এখন রীতিমত একটা গাল হইয়া উঠিয়াছে; শুধু রোম্যান্টিক্‌বাদ নয়, কাব্য-কবিতার ভিতরে 'কাব্য'ই হইয়া উঠিয়াছে নিতান্ত একটা বিদ্রূপের বস্তু, ওটা যেন নিছকই চলিতেছে একটা 'কাব্য-করা'। ইহার প্রতিক্রিয়া সর্বত্র না হইলেও সাধারণতঃ, এবং বিশেষ করিয়া সস্তাদরের কবি মহলে চলিতেছে দুই দিকে,—একদিকে চলিতেছে কাব্যের সুসজ্জিত মনোরম দেহে যতটা সম্ভব নর্দমার দুর্গন্ধ কর্দম এবং রান্নাঘরের ঝুল মাখাইয়া তাহাকে রীতিমত কাব্যের আচার এবং সংস্কার-বর্জিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা, অন্যদিকে চলিতেছে বুদ্ধির কড়া পাক,—যাহার ঝাঁঝালো স্বাদ ও গন্ধ নিরন্তর সজাগ করিয়া দিতে চাহিতেছে আমাদের ভাব-বিলাসী মনকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে আমরা রীতিমত অভিযোগ

আনিতে আরম্ভ করিয়াছি রোম্যান্টিক্ বলিয়া, এবং আরও বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, রোম্যান্টিক্‌বাদের ভিতর দিয়াই জাগিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রকাব্যে পলায়নবাদ (Escapism)।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে আজকালকার আমাদের সাধারণ অভিযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই বাস্তব সংসার—বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হন নাই। জগৎ এবং জীবনকে তিনি প্রধানতঃ দেখিয়াছেন তাঁহার কল্পনার অশ্লীন স্বপ্ন-বিলাসের ভিতর দিয়া, আর কতগুলি অবাস্তব বিশ্বাস, আদর্শ ও ভাবধারার ভিতর দিয়া। তিনি সর্বদাই জীবনের রূঢ় বাস্তবতার পাশ এড়াইয়া তাঁহার স্বপ্নের স্বর্গে বাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করিয়া কোনও ওকালতির প্রয়োজন নাই। আগে আমাদের কথাটাই স্পষ্ট করিয়া বোঝা যাক্। আমরা বলি, রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক্-পন্থী, আমরা বাস্তব-পন্থী;—রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যার অন্ধকারের কালো কেশদামের ভিতরে শুধু রহস্যে মশ্‌গুল হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যে কবিতা লিখি তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারের কেশদাম লইয়া নয়, তাহা আমাদের রক্ত-মাংসের বাস্তব প্রিয়ার একান্ত বাস্তব কালো চুলগুলি লইয়া। কিন্তু কি লিখি? সেই প্রেয়সীর কালো মিশ্‌মিশে

চুলগুলির ভিতরেই খুঁজিয়া পাই সন্ধ্যার অন্ধকারের রহস্য—তাহার ভিতরেই যাই একেবারে ডুবিয়া। রোম্যান্টিক্‌বাদ এবং বাস্তববাদের ভিতরে তফাৎ হইল তাহা হইলে কোন্‌টুকু? না—রোম্যান্টিক্ কথাটিকে উল্টাইয়া লইলেই সে হয় রিয়ালিষ্টিক্। আকাশে যখন পাখী উড়িয়া যায়, তাহার পাখার ঝাপটায় ভাঙিয়া যায় নৈঃশব্দ্যের ধ্যান, ভাঙিয়া যায় ধরণীর ঘুম, আমরা তখন বলি, এটা হইল নিছক রোম্যান্টিক্‌বাদ; কিন্তু ধরণীর সেই ঘুমই যখন ভাঙিয়া যায় আকাশচারী বিমানের পাখার ঘর্ঘর ধ্বনিতে তখনই সে হইয়া ওঠে রিয়ালিষ্টিক্। মোটের উপরে নক্ষত্রখচিত নিশায় আকাশের যে রহস্য সেটা নিতান্তই রোম্যান্টিক্, আর সেই রহস্যই হইয়া ওঠে রিয়ালিষ্টিক্ যখন সে ফুটিয়া ওঠে রূঢ় দিবসের গায়ে গায়ে। এখানে দৃষ্টির যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু তাহাতে রোম্যান্টিক্‌বাদের সমূলে বিনাশ ঘটিয়াছে কিনা তাহাই বিশেষভাবে বিচার্য। তথাকথিত 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর ভিতরে বাস্তব জীবনের সহিত নৈকট্য লাভের জন্য যে একটা অচেতন এবং ততোধিক সচেতন চেষ্টা রহিয়াছে তাহা অনেক স্থানে পরিস্ফুট; কিন্তু এই চেষ্টার ভিতর দিয়া আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা হয়ত রোম্যান্টিক্‌বাদেরই

সূক্ষ্মতর রূপ। অক্ষমের হাতে রোম্যান্টিক্‌বাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ আবার রূপান্তরিত হইতেছে একটা সস্তাদামের হাল-ফ্যাশানি ঢঙে। এ-জাতীয় কবিগণের মনে কেমন করিয়া এই একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিশ্ব-সৃষ্টির ভিতরে কতগুলি জিনিস আছে যাহা প্রকৃতিতেই রোম্যান্টিক্‌ এবং অন্য কতগুলি জিনিসের উপর বিধাতা-পুরুষই একটা 'রিয়ালিজ্‌ম্‌' এর অপরিবর্ত্তনীয় ছাপ মারিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং কাব্য-কবিতার রচনাকালে যদি একটু অবহিত হইয়া রোম্যান্টিক্‌ বিষয়-বস্তুগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া দূরে ঠেলিয়া দেওয়া যায় এবং শীল-মোহর করা রিয়ালিষ্টিক্‌ বিষয়-বস্তুগুলিকে খুঁজিয়া বাছিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই গোড়ার গলদ দূর হইয়া যায়। ইঁহাদের এই কাব্যপ্রচেষ্টা দেখিয়া শুধু থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়,—

'মন না রঙায়ে কি ভুল করিয়ে
কাপড় রঙাল যোগী'!

'রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌' বা 'রিয়ালিজ্‌ম্‌' কোনো বস্তুর ধর্ম নহে, উহা কবিমনের ধর্ম। মনভরা ভাববিলাস লইয়া এখান হইতে সেখান হইতে জীবনের কয়েকটা এবড়ো-খেবড়ো দৃশ্য যোগাড় করিয়া তাহার সহিত গোটাকয়েক গালভরা কথা মিশাইয়া দিতে পারিলেই পাকা বাস্তবপন্থী বনিয়া যাওয়া

যায়, এই বিশ্বাসটাই একটা গোড়ার গলদ। অধিকন্তু আমাদের এ-কথাও প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা উচিত যে, চাঁদ, নদী, ফুল, পাখীর গান প্রভৃতি লইয়া জীবনের ক্ষেত্রে যাঁহারা শুধু পলাতক হইয়া ভাববিলাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিন্দার্হ হইতে পারেন, কিন্তু যেখানে কলের চিমনীর ভিতর দিয়া সর্বহারাদের তাজা লাল রক্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশের মুখে মাখাইয়া দিয়াছে কালি—তাহা লইয়া যে ভাববিলাস তাহা একান্তই নিষ্ঠুর।

আমরা আজকাল রক্তমাংসের বাস্তব কবিতা লিখিতে গিয়া সাধারণতঃ যে-জাতীয় কবিতা লিখিয়া থাকি তাহার একটি নমুনা গ্রহণ করা যাক। কবিতাটি একটি সাঁওতালী তরুণীকে লইয়া। কলিকাতা মহানগরীর একটি উপেক্ষিত ময়লাজমা উপকণ্ঠে চলিয়াছে তাহার যাযাবর জীবনের সাময়িক অবস্থিতির আয়োজন। নিরাভরণ এবং অনেক-খানি নিরাবরণ তাহার মিশ্‌মিশে কালো তারুণ্য,—জীবনের চারিপাশে আছে তীব্র দারিদ্র্য, আছে হিংস্র বর্বরতা, পঙ্কিল ক্লিন্নতা, অসংস্কৃত দুর্বার আনন্দ। পাশে চলিয়াছে নিত্যনবপরিকল্পিত মোটরযানে বিংশ শতাব্দীর নাগরিক জীবন, অঙ্গে অঙ্গে তাহার সুরুচি ও সভ্যতার প্রসাধন; প্রাণের বেগে সে আর চলিতে পারে না,

তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে যন্ত্রের আবেগ। এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ,—প্যারিস্‌নগরীর বলনৃত্য—পর্যুদস্ত গ্রীসের ক্ষুধার্ত হাহাকার, রাশিয়ার বুকে বোমার বিস্ফোরণ, হিটলারের হুম্‌কি—'বড়দিদি'র গৌরবোজ্জ্বল শততম রজনী—ছ'আনা সের বেগুন—পাতলা ভিজা ঘুঁটে—আর এই অষ্টাদশী সাঁওতালী! ফল্গুস্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে শানবাঁধান প্রকৃতির কোলে মানুষের আদিম জীবনধারা—দুর্বার আনন্দ—অসীম বিস্ময়! কলিকাতার দুর্গন্ধি কর্দমাক্ত উপকণ্ঠ—তালপত্ররচিত মঞ্চ—আশে পাশে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে শূকরছানা,—তাহারই ভিতরে প্রতিষ্ঠিত সাঁওতালী মেয়ের পাষাণ-প্রতিমা—তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে আদিম জীবনের অসীম বিস্ময়! সাঁওতালী মেয়ে তাহার আটপৌরে দেহ লইয়াই বিস্ময়ের পাষাণপ্রতিমা হইয়া উঠিয়াছে,—তথাপি রোম্যান্টিক্-মন্দিরে তাহার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে আমাদের যত আপত্তি। আমাদের 'রিয়ালিষ্টিক্' কবিতা, সব না হইলেও অধিকাংশই, এই প্রকৃতির।

কেহ যদি নৈষ্ঠিক তাত্ত্বিক সাজিয়া আসিয়া বলিতে চাহেন যে রোম্যান্টিক্‌বাদ সাহিত্য হইতে চিরতরে নির্বাসিত হইয়াছে, আমরা সে কথা মানিব না। আমরা বলিব,

সাহিত্য হইতে রোমান্টিকবাদ যায় নাই, যাইতে পারে না ; গভীরতর রোমান্টিকবাদ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে অত্যাধুনিক কবিতার অঙ্গে অঙ্গে। মোনালিসার হাসি, বিয়াত্রিসে'র প্রেম, মিশরের মমি, ছ্যাতলাপড়া পোড়ো বাড়ির দুর্গন্ধ অন্ধকারে বাদুরের ডাক—আর তাহার সহিত এখানে সেখানে সবহারা ভুখা ভগবানের আর্তির টাটকা গরম-মশলা মিশাইয়া যে সবরং রচিত হইতেছে, তাহাই নিছক আমাদের রক্তমাংসের দেহের কথা এবং নিরাভরণ মনের কথা একথা স্বীকার করিতে যথেষ্ট আপত্তি আছে। আসলে, বিশ্ব-প্রকৃতি এবং বিশ্ব-জীবন যখন তাহার প্রাতিভাসিক রূপটির ভিতরেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া আমাদের অন্তরের ভিতরে গিয়া একটি নূতন গভীরতর রূপ পরিগ্রহ করে এবং আমাদের অন্তরকে সেই নবরূপের অসীম রহস্য এবং বিস্ময়ে দেয় ভরিয়া, তখনকার সেই রহস্য এবং বিস্ময়কেই যদি আমরা গ্রহণ করি রোমান্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গির মূল বলিয়া, তবে তাহা চিরন্তনের।

তাহা হইলে কি 'রবীন্দ্রযুগ' এবং 'রবীন্দ্রোত্তর যুগে'র সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে কোথাও কোন পার্থক্য ঘটে নাই? অবশ্যই ঘটিয়াছে। সে পার্থক্য কোথায়? সে পার্থক্য এইখানে যে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ব-সৃষ্টির ভিতরে

পাইয়াছিলেন অসীম রহস্য এবং বিস্ময়ের সন্ধান তাহা অনেকখানিই হয় বাস্তব জীবনকে ছাড়াইয়া অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া, অথবা বাস্তব জীবনকে এড়াইয়া চলিয়া। রবীন্দ্রনাথের মধ্যজীবনের কোথাও কোথাও মনে হয়, তাঁহার কাব্য 'বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি';—আকাশেই যেন ছুটিয়া চলিয়াছে অনেকখানি, মাঝে মাঝে মাটির পৃথিবীতে লাগিয়াছে পায়ের ছোঁওয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যের ভিতরেই দেখিতে পাই দৃষ্টির পরিবর্ত্তন, ধূলি-মাটির পৃথিবীকে কবি সেখানে জড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছেন আরও নিবিড় করিয়া। রবীন্দ্রোত্তর যুগের দৃষ্টিভঙ্গির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সেও চায় অসীম রহস্য, অসীম বিস্ময়,—কারণ, এই রহস্যবোধ এবং বিস্ময়বোধ ব্যতীত কোন সাহিত্যই কোনদিন গড়িয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু সে এই রহস্য, এই বিস্ময়কে লাভ করিতে চায় এই দুর্গন্ধি কর্দমাক্ত মাটির পৃথিবী হইতেই, রূঢ় বাস্তব জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ হয়ত সন্ধ্যা-সুন্দরীর অন্ধকারের কালো কেশদামের ভিতরে খুঁজিয়াছেন যে রহস্য, আধুনিক কবিরাও করিবেন সেই রহস্যেরই সন্ধান, কিন্তু প্রেয়সীর কালো কেশদামের ভিতরে। জীবনকে নিঙরাইয়া বাহির হয় যে রহস্য এবং বিস্ময়ের ধারা

তাহাকেই আমরা নাম দিই 'রিয়ালিজ্‌ম্'. আমি 'রিয়া-লিজ্‌মে'র আর কোন সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাই না।

অবশ্য এই যে রবীন্দ্রনাথের যুগ এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের ভিতরে একটি পার্থক্যের রেখা টানিতে চেষ্টা করিলাম, ইহা কোথাওই তেমন স্পষ্ট নহে, বিশেষ করিয়া কবিতার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত দুইটি নরনারীর যুগল প্রেম-স্রোতের সন্ধান করিতে চলিয়া গিয়াছেন 'অনাদি কালের আদিম উৎসে'; আমরা হয়ত যাযাবর বেদিনী কিশোরীর সর্পিল উপলবন্ধুর জীবন-পথে চলিতে চলিতে গিয়া উপস্থিত হই আদিম জীবনের শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানীর ভিতরে। রবীন্দ্রনাথ ঝিলমনদীর তীরে বসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে স্তব্ধতার তপোভঙ্গকারী বলাকার পক্ষধ্বনিকে মিলাইয়া দিয়াছেন চলমান বিশ্ব-নিখিলের পক্ষধ্বনির সহিত, আমরা হয়ত গ্রীষ্মের দুপুরে কলিকাতার ঘর্মাক্ত রাজপথে বসিয়া ট্রামের চাকার ঘর্ঘরধ্বনিকে মিলাইয়া দিব মহাকালের রথচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনির সঙ্গে। তাহাতে করিয়া অন্ততঃ কবিতার ক্ষেত্রে যে জীবনের সহিত আমাদের কতটা অধিকতর নৈকট্য লাভ ঘটিয়াছে তাহা সব সময় বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না।

আমরা হয়ত বলিব, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রধান অভিযোগ তাহা তাঁহার 'পলায়নবাদে'র বিরুদ্ধে।

আমাদের আজিকার এ অভিযোগ অনেকখানি সত্য; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এ অভিযোগের সত্যতা তত্ত্বে নহে, ইতিহাসে। তত্ত্বের দিক হইতে যদি কেহ বিচার করিতে আসেন, তবে আমরা বলিব, 'পলায়নবাদ' সাহিত্য-সৃষ্টির মূল কারণ। জীবন মানুষের ভাল লাগিত, কিন্তু জীবনের সবটা না,—তাই রূঢ় বাস্তব-জীবন হইতে মানুষ খানিকটা পলায়ন করিয়া জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল সাহিত্যে। বাস্তব জীবনের সবখানি লইয়া আজও আমরা খুশী না,—তাই আজও জীবন হইতে পলাইয়া আসি সাহিত্যে। বাস্তব-জীবন আর সাহিত্যের জীবন যদি এক এবং অভিন্ন হইত, তবে কোনদিন জীবনের উপরন্তু এই বিপুল সাহিত্য গড়িয়াই উঠিত না। কিন্তু যুগে যুগে সেই 'পলায়নবাদে'র সীমা বদলাইয়া যাইতেছে, এবং সেই পরিবর্তনের পশ্চাতেও তত্ত্ব অপেক্ষা বেশী করিয়া রহিয়াছে ইতিহাস। সাহিত্য এবং জীবনের ভিতরে একটা যবনিকার ব্যবধান চিরন্তন কালের জন্যই থাকিবে, কারণ সাহিত্য-সৃষ্টির ইহাই স্বভাব; তবে কোন্ যুগে সেই যবনিকার জমিনটি কিরূপ হইবে তাহা অনেকখানিই নির্ধারিত করিয়া দেয় যুগের ইতিহাস।

আমরা আজকাল সচরাচর বলিয়া থাকি, আমরা

ভাববিলাস ছাড়িয়া বাস্তবপন্থী হইয়া উঠিতেছি। কিন্তু এই বাস্তবপন্থার একটা নমুনা লওয়া যাক্। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর। আকাশ হইতে অদৃশ্য আগুন ক্ষরিয়া পড়িতেছে কলিকাতার গলিয়া যাওয়া পীচের রাস্তার উপর। ঠুং ঠুং করিয়া দৌড়াইয়া চলিতেছে একটি বলিষ্ঠ যুবক রিক্সাওয়ালা, —কালো দেহটি ঘর্মে হইয়াছে তৈলাক্ত। তাহার সেই ঠুং ঠুং শব্দের ভিতর দিয়া আমার মনে আসিয়া পৌছিতেছিল নিপীড়িত মানবাত্মার করুণ ক্রন্দনধ্বনি, আর্তির অভিযোগ। কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিলাম, সারাদিনের কর্মের পর এই রিক্সাওয়ালা যখন ঘরে ফিরিয়া তাহার মা-বাবার নিকটে জমা দিবে তাহার উপার্জনের অর্থ, তখন তাহার প্রত্যেকটি তামার পয়সা তাহার মা-বাবার নিকট দেখা দিবে তাহাদের পুত্রেরই জমাটবাঁধা ধূলিমলিন রক্তবিন্দুর ন্যায়, চিত্ত তাহাদের ভরিয়া উঠিবে রিক্সাওয়ালা জীবনের দুর্বিষহ অপমানে। পাশে বসিয়াছিলেন একজন অধ্যাপক বন্ধু। তিনি বলিলেন যে, আমার কল্পনা হয়ত অনেকখানি ভুল। আজ সন্ধ্যার পরে ওই রিক্সাওয়ালা যুবকটি যখন বাড়িতে পৌছিবে, তখন হয়ত গিয়া দেখিবে তাহার বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া তাহার পিতার সহিত অপেক্ষা করিতেছে আর একজন অপরিচিত রিক্সাওয়ালা, তাহারই হাতে তাহার

কন্যাটি দান করিতে। সেই অপরিচিত লোকটির সাক্ষাতে যখন যুবকটি তাহার পিতার হাতে ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া ঢালিয়া দিল তাহার সারাদিনের উপার্জিত পয়সাগুলি, তখন হয়ত গর্বে পিতার বুক উঠিয়াছে ফুলিয়া,—ছেলের চওড়া মাংসল ছাতিটির উপর সাদরে চাপড় দিয়া হয়ত পিতা সেই ভাবী বৈবাহিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিবে,—এমনই রোজ কামাই করে তাহার লেড়কা,—এই তামাম গ্রীষ্মের রোদটা তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে তাহার কোনই ক্লান্তি নাই,—দিনে সে মাইলকে মাইল টানিয়া চলে সোয়ারীর পর সোয়ারী,—এমনই জোর-জোয়ান তাহার ছেলে। আমার মার্ক্সপন্থী মনের ভিতরে সহসা ধাক্কা লাগিল বটে,—কিন্তু অনেক ভাবিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, ইহার ভিতরে বাস্তব সত্য কোন্‌টি। তথাপি একথা জানি, আজ এই সমাজতন্ত্রবাদের যুগে যদি শিক্ষিত যুবকশ্রেণীর ভিতরে ভোট লওয়া যায়, তবে আমি ওই রিক্সাওয়ালার ভিতরে যে সত্য দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাই প্রমাণিত হইবে খাঁটি বাস্তব সত্য বলিয়া। যুগের বাণী সব জমা হইতেছে মনে, তাহারই প্রভাবে চোখে লাগিতেছে নূতন রঙ,—সেই রঙে রঞ্জিত সত্যকেই আমরা অনেকক্ষেত্রে গ্রহণ করিতেছি বাস্তব সত্য বলিয়া। আমাদের বাস্তবপন্থী

সাহিত্যে আমরা চাই বাস্তবজীবন ও বাস্তবজগতের 'আসল রূপ'টি ফুটাইয়া তুলিতে; কিন্তু সেই 'আসল রূপ'কে কখনও কি রক্তমাংসের চোখে দেখা যায়? তাহাকে যেটুকু দেখি সেইটুকুই দেখি মনে। নিছক চোখে-দেখা জিনিস লইয়া কোনদিন কোন কাব্য-কবিতাই গড়িয়া উঠিতে পারে না।

তাই বলিতেছিলাম, রোম্যান্টিক্‌বাদ্ যায় নাই। বিংশ শতাব্দীতে অন্তরের দৃষ্টি ব্যতীত নিছক চোখের দৃষ্টি একেবারে অসম্ভব; আর যেখানেই অন্তরের দৃষ্টি, সেইখানেই ঘনীভূত হইয়া উঠিবে অসীম বিস্ময়। ঠিক তেমনি আদর্শবাদও যায় নাই, যাইতে পারে না। বিংশ শতাব্দীতে একেবারে সাদাচোখে কোন কিছুর দিকে তাকাইবার অধিকারই আর মানুষের নাই। মাথার ভিতরে হাজার রকমের মতবাদ করিতেছে গিস্ গিস্—তাহাদের ঠেলাঠেলির গতিবেগ রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে অসহ্য তাপে,—তথাপি বাহিরের জগতের পানে জীবনের পানে তাকাইব একেবারে সাদা-চোখ লইয়া—ইহা চরম মিথ্যা। রোম্যান্টিক্‌বাদ আছে—সে শুধু ঢং বদলাইয়াছে, আরও গভীর, আরও সূক্ষ্ম রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সেই নূতন ঢংকেই আমরা মনে করি নিছক বাস্তববাদ। তেমনি আদর্শবাদও খুবই আছে—শুধু আদর্শ বদলাইয়াছে; সেই রূপান্তরিত আদর্শকে

লইয়া যে আদর্শবাদ, তাহাকেই বলিতেছি নিছক বাস্তববাদ।

কিন্তু তর্ক ছাড়িয়া দিতেছি; মোটের উপরে মানিয়া লইতেছি রোম্যান্টিক্‌বাদ ও বাস্তবাদের তফাৎ এবং মানিয়া লইতেছি রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের দৃষ্টি-ভঙ্গীর তফাৎ। সে তফাৎ অনেকখানি, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে তফাৎ সত্যিকার কিসের জন্য? আধুনিকেরা আত্মপক্ষ-সমর্থনে কাব্যতত্ত্বকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইতে লাগিয়া গিয়াছেন, সত্যকার কাব্য কি, সাহিত্য কি, আর্ট কি; এবং সেই নবাবিষ্কৃত সত্যদৃষ্টিতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুর্বলতা এবং আমাদের সবলতা। প্রাণধর্মের ইতিহাসকে বাদ দিয়া আবার সেই তত্ত্ববুদ্ধির ওকালতি! সত্যিকারে কাব্য কি—তাহার প্রাণ কি হওয়া উচিত—বাহিরের রূপ কি হওয়া উচিত—তাহা কেহ কখনও জানে নাই, কোন দিন জানিতে পারিবেও না। কারণ, সাহিত্যের ধর্ম প্রাণবেগে গতির ধর্ম। সুদূর অতীত, চলমান বর্তমান এবং অনন্ত ভবিষ্যতের ভিতর দিয়া রহিয়াছে তাহার সমগ্রতার ধর্ম,—বর্তমানের ভাসমানতার ভিতরে সেই ধর্মের কতটুকু সন্ধান মিলিতে পারে? তাই বিশেষ বিশেষ দেশকালের বন্ধনে বাঁধিয়া

যেখানেই আমরা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করি সাহিত্যের সমগ্র এবং শাশ্বতরূপকে, সেইখানেই আমরা করি ভুল। সাহিত্যের সেই অখণ্ড গতিধর্মের ভিতরে তাহার সকল অংশ —সকল বিশেষ বিশেষ রূপই একটা গভীর ঐক্যসূত্রের ভিতরে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে,—সেখানে তাই কোন অংশই মিথ্যা নহে। সাহিত্যের এই সমগ্ররূপকে আমরা প্রতি দেশে প্রতিযুগে পাইতে চাহিয়াছি বর্তমানের খণ্ডরূপের ভিতর দিয়া। এইখানেই আমাদের ভুল। চলার পথে বর্তমানের যে রূপ তাহা সাহিত্যের সমগ্র স্বরূপের কতটুকু সন্ধান দিতে পারে? অবিরাম আবর্তনের স্রোতবেগে ভাসিয়া উঠিতেছে এই বর্তমান তাহার বিশেষ রূপকে লইয়া,—এমন যে কত বিশেষরূপ আসিবে এবং যাইবে তাহার কতটুকু আমাদের জানা আছে? কি কি ঐতিহাসিক কারণে, কি কি পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে সাহিত্য কি হইয়া উঠিয়াছে আমরা বড় জোর তাহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে পারি, সেই সম্বন্ধেই কথা বলিতে পারি; কিন্তু চিরন্তন কালের জন্য তাহার কি হওয়া উচিত অনুচিত তাহা বলিতে যাওয়া আমাদের নিষ্ফল স্পর্ধা।

বর্তমান যুগে সত্যই যদি রোম্যান্টিক্‌বাদের পতন ঘটিয়া বাস্তববাদের জয়জয়কার হইয়া থাকে, তবে তাহা এই কারণে

নয় যে সাহিত্যক্ষেত্রে তথাকথিত বাস্তববাদ রোম্যান্টিক্‌বাদ অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে, তথাকথিত রোম্যান্টিক্‌ কবিতায় আমাদের নানা কারণে অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, মনে আসিতেছে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া; সেই তীব্র প্রতিক্রিয়াই দেখা দিয়াছে প্রেয়সীকে আর—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা' না বলিয়া তাহার গায়ের চামড়া কাটিয়া খানিকটা রক্তমাংস দেখাইয়া দিবার প্রবৃত্তির ভিতরে, অথবা প্রেয়সীকে মাঝখানে বসাইয়া তাহার চারিপাশে কয়েকটি বুদ্ধির পাক খাইয়া উঠিবার ভিতরে। রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে মনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে একদিক হইতে যুক্ত হইতেছে বর্ত্তমান জড়বাদের ক্রমবিবর্ধমানতার ফলে দেহ-সর্বস্ব দৃষ্টি,—অন্যদিক হইতে আসিয়া যুক্ত হইতেছে বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য; এই ত্রয়ের সমাবেশে গঠিত আমাদের বর্ত্তমান কবিতার দেহ-প্রাণ। এই সকল ঐতিহাসিক সত্যকে একেবারেই চাপা দিয়া রাখিয়া আমরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য চারিদিকে ঘিরিয়া দিতেছি শুধু তত্ত্বের জাল।

আমাদের এই জগৎটায় জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার প্রশ্নই ক্রমান্বয়ে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে; আমাদের দৃষ্টিকেও ক্রমান্বয়ে জগতের আশ-পাশ সব জায়গা

হইতে গুটাইয়া লইয়া কেন্দ্রীভূত করিতে হইতেছে একমাত্র এই জীবন-সংগ্রামের দিকে। সাহিত্যের ভিতরেও তাই ক্রমান্বয়ে ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে সেই জীবন-সংগ্রামেরই সমস্যাগুলি। আমাদের জীবন-সংগ্রামের মূলীভূত কারণ-রূপে রহিয়াছে যে যৌনবোধ ও ক্ষুধা, সাহিত্যের ভিতরেও প্রধান হইয়া উঠিতেছে তাহাই। এই ক্ষুধার সমস্যাই এই সভ্যজগতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে; আমাদের সকল প্রকার মূল্যবোধও তাই আজ ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিতেছে যৌননীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি দ্বারা। আজ সাহিত্যিকদিগকে তাই 'ফ্যাসিষ্ট' ও 'ফ্যাসি-বিরোধী' দলে ভাগ হইয়া লইতে হয়। এখানে আর্ট বা সাহিত্যের কোন বিশুদ্ধিতত্ত্ব আওড়াইলে চলিবে না, ইতিহাসের স্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে বসিয়াছে। ইতিহাসের আবর্তনে জীবন-সংগ্রামের রূঢ়তা আজ সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন কঠোরভাবে যে, তাহাকে আর অবজ্ঞা করিয়া চলিবার সাধ্য নাই, বাস্তববাদ আজ তাই যুগধর্ম, এবং সেই কারণেই সে আজ সাহিত্যেরও ধর্ম।

ইউরোপের মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাহিত্যের যদি তুলনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব উভয়ের

ভিতরে তফাৎ অনেকখানি। মহাযুদ্ধের পরবর্তী সাহিত্যের আদর্শে এবং রূপে দেখা দিয়াছে আমূল পরিবর্তন। এ পরিবর্তনকে কোন তত্ত্ব বা মতবাদ বহন করিয়া আনে নাই, এ পরিবর্তন সাধন করিয়াছে ইতিহাস। যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালের সাহিত্যিকগণ সৌন্দর্যকে খুঁজিতেন জগতের এবং জীবনের সুসঙ্গতি, সৌষম্যের ভিতরে; কিন্তু মহাযুদ্ধের বিষবাষ্পের বিষক্রিয়া তড়িৎবেগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল শুধু ইউরোপের দেহে নয়, মনের আনাচে-কানাচেও; সেই বিষক্রিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে জীবনের সব সুষমা,—শ্বেতপদ্মাসনা বীণাপাণিকে তাই তাহারা সাজাইয়া দিয়াছে রক্তাম্বরে বজ্রপাণি রূপে। একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন, "যুদ্ধের পরবর্তী দশকে কবিগণ যে শুধু মানুষের ছিন্ন হস্ত-পদের বেদনাই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার সঙ্গে তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন মানুষের ছিন্নভিন্ন বিশ্বাসের বেদনা।"* সেই ছিন্নভিন্ন হস্তপদ, সেই ছিন্নভিন্ন সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন,—সেই ছিন্নভিন্ন বিশ্বাস—তাহাই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে

* "During the dacade which followed the war the poets had time to exlore the ache a man feels in amputated beliefs as well as in amputated hands and legs."—This Modern Poetry—Deutsch.

যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস; সেই ইতিহাসের বুক হইতেই বুদ্ধির কড়াপাকে নিষ্কাষিত হইতেছে বিভিন্ন রকমের আধুনিক মতবাদ। জীবনের উপরে সেই বিষবাষ্পের ক্রিয়া আমাদের দেশে আমরা এখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষে লাভ করিয়াছি অনেকখানি ইউরোপীয় সাহিত্যের মারফতে। আমাদের জীবনের উপরেও এখন পর্যন্ত সে জাতীয় বোমা-বিস্ফোরণ ঘটে নাই বটে, তবে তাহার আয়োজন আসিতেছে সবদিক হইতে ঘনাইয়া। আমাদের সাহিত্যের আদর্শে এবং রূপেও তাই দেখা দিতেছে দ্রুত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি রাশি রাশি তত্ত্বকথা সাহিত্যের শাশ্বত রূপ কি হওয়া উচিত এবং কি না হওয়া উচিত তাহা লইয়া।

প্রতিপক্ষের সাহিত্যিকগণই বা কম বোদ্ধা কিসে? তাঁহারাও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন সাহিত্যের আসল তত্ত্ব—এবং গুরুগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহাদের তত্ত্বের বনিয়াদ এত সুদৃঢ় যে তাঁহাদেরও আর মৃত্যু নাই,—পক্ষান্তরে মহাকাল আসিয়া তাহার নিষ্ঠুর সম্মার্জনী দ্বারা এই সব চপলমতি বালখিল্য সাহিত্যিকগণের সৃষ্ট আবর্জনাকে দুই হাতে ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহাদের

রাজপথ আবার পরিষ্কার করিয়া দিবে অনতিবিলম্বে। উভয়তঃ চলিতেছে বাগ্‌যুদ্ধ—মসীযুদ্ধ,—অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে মহাকাল। প্রবীণ পণ্ডিতগণ এই সব চপলমতি ছেলে-ছোকরার দলকে উচ্চমঞ্চ হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাদের উপরে যতই উপদেশামৃত বর্ষণ করুন না কেন, বা নিন্দাবাদের শর নিক্ষেপ করুন না কেন, "এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"—সুতরাং ছেলে-ছোকরার দল যে 'হরে মুরারে' বলিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে তাহাকে একেবারে থামাইয়া দিবার কাহারও সাধ্য নাই। আমরা হয় ত আমাদের সে অক্ষমতাকে আজ স্বীকার করিব না; কিন্তু সাহিত্যের তত্ত্ববুদ্ধি যে সাহিত্যের সজীব প্রাণধারাকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে ফিরাইয়া দিতে পারে, আমাদের সে ভুল ভাঙিয়া দিবে সেই একই মহাকাল।

বর্তমান কবিতার প্রকৃতির সহিত আকৃতিও বদলাইয়া গিয়াছে অনেকখানি। মিলের বালাই এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে; পূর্বের ন্যায় মাত্রা, যতি, ছেদ প্রভৃতিরও কোন সুস্পষ্ট রীতি নাই;—কবিতা অধিকাংশই লিখিত গদ্যচ্ছন্দে। সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যতত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে,—আমরা বলিতেছি, আমাদের কাব্যবিহারী মন আকাশবিহারী পাখীর মতন,—কড়ায় গণ্ডায় মাপা ছন্দোবন্ধ তাহার পায়ে সোনার শৃঙ্খল,—

ও শৃঙ্খল যত শীঘ্র খুলিয়া ফেলা যায়, কাব্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। সত্যিকারের কাব্য জাগে হৃদয়ের স্বতঃউৎসারণে, তাহাকে বাহিরে অনেকখানি সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে গেলেই তাহার ভিতরে আসে অনেকখানি কৃত্রিমতা। রসের অনুপ্রেরণায় আমাদের চিত্ত যখন ভরিয়া যায় শ্রাবণ-মেঘের ন্যায় ভাবসম্বেগের প্রাচুর্যে, তখন তাহাকে বসিয়া ইনাইয়া বিনাইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলিবার অবসর কোথায়? আর আমাদের কাব্য-প্রেরণার ভিতরে আমাদের ভাবগুলি সর্বদা কোন নৈয়ায়িক পন্থায় গুছানো বা ভদ্রভাবে সাজানো থাকে না,—সুতরাং এতখানি সাজানো গুছানো বা ছন্দোবন্ধ কাব্যের আত্মার ধর্ম নহে,—অনেকখানিই দৈহিক, সুতরাং তাহারা কাব্যের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য নহে। আমাদের কাব্যলোকটি সর্বদা আমাদের চেতনলোকের এলাকার অন্তর্বর্তী নহে,—সে ছড়াইয়া আছে বেশীর ভাগই আমাদের চেতনের বাহিরে—চেতনের পটভূমি অবচেতন এবং অচেতনে। কাব্যকে আমরা যত বেশী করিয়া সাজাইতে গুছাইতে চাই, ততখানি তাহাকে লইয়া আসি অবচেতন হইতে চেতনে,—আর এই অবচেতন হইতে চেতনে আনিয়া আমরা অনেকখানি ব্যাহত করি তাহার স্বরূপকে। তাই আধুনিক কবিরা বলেন, কাব্য আমাদের অবচেতনে তাহার যে স্বরূপে অবস্থান

করে আমরা বাহিরে যতটা পারি তাহাকে তাহার সেই অব্যাহত এবং অবিকৃত রূপেই প্রকাশ করিব।

যুক্তিতর্ক লইয়া বিচার করিলে ইহার বিরুদ্ধেও বলা যাইতে পারে অনেক কথা। কাব্য যেখানেই ছন্দ, মিল ও অলঙ্কার-সমন্বিত হইয়া ওঠে, সেইখানেই যে তাহাকে অবচেতনের অন্ধকার লোক হইতে বাহির করিয়া আনিয়া চেতনলোকের স্পষ্ট আলোকে বহুক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা হয় এবং তাহার পর আস্তে ধীরে তাহাকে একটু একটু করিয়া ছন্দে, মিলে, অলঙ্কারে সাজাইয়া গুছাইয়া বাহিরে প্রকাশ করা হয়, এই কথাটাই মূলতঃ সত্য নহে। উত্তম কাব্যের বেলায় কাব্যের দেহ ও আত্মার ভিতরে থাকে একটা নিগূঢ় অদ্বয় যোগ,—শব্দ ও অর্থ থাকে পার্বতী-পরমেশ্বরের মতন অভিন্ন হইয়া। অচেতন, অবচেতন এবং চেতনের সমবায়ে গঠিত কবির চিত্তভূমিতে কাব্যের দেহ ও আত্মা গড়িয়া ওঠে একই ধারায়—একই ছন্দে,—আলঙ্কারিকেরা তাই উহাকে বলিয়াছেন, 'অপৃথগ্-যত্ন-নির্বত্যঃ'। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাটির ছন্দ ও ঝঙ্কারকে সমগ্র কবিতাটি হইতে কখনও পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। এই কবিতাটি ছন্দ এবং মিল সমন্বিত বলিয়া ইহার প্রাণবস্তু কোনোরূপে ব্যাহত হইয়াছে এবং ছন্দ এবং মিল তুলিয়া দিলে

এই কবিতাটি আরও ভাল হইতে পারিত, এই কথা মানিব না।

তারপরে কবিতাকে ছন্দোবন্ধে সাজাইয়া গুছাইয়া বলিবার জন্য যদি একটা সচেতন প্রচেষ্টা থাকেই এবং তাহার ভিতরে যদি একটু কৃত্রিমতাও থাকিয়া যায় তবেই যে তাহা কাব্যের ক্ষেত্রে একান্তভাবে পরিহার্য এমন কথাও বলা যায় না। মানুষের সচেতন প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া আসিয়া পড়ে যে কৃত্রিমতা তাহা দ্বারা আমাদের জীবন রহিয়াছে ভরপূর হইয়া,—জীবনের ভিতরে এই বিংশ শতাব্দীর মনও তাহাকে বরদাস্ত করিয়া চলিয়াছে পদে পদে ; সুতরাং শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই বা হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলে চলিবে কেন? 'নগ্নবাদ' ব্যবহারিক জীবনে এখন পর্যন্তও কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না, এখনও তাহাকে হাজার রকম বিধি-নিষেধের ভিতরে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয় সভ্যজগতের উপকণ্ঠে,—শুধু কাব্যের জগতেই তাহাকে লইয়া মাতামাতি করার সার্থকতা কি? আর আমরা যে অনিবার্য ভাবসম্বেগের কথা বলি, তাহাও অনেকখানিই বলি তর্কের খাতিরে ; কারণ, আধুনিক কবিতার সহিত যাঁহারই একটু পরিচয় আছে তিনিই এ-কথায় সাক্ষ্য দিবেন যে, আধুনিক কবিতায় হৃদয়ের উপাদান হইতে বুদ্ধির উপাদান কিছু

কম নহে। হৃদয়াবেগের যেখানে প্রাধান্য সেখানে ত কবিতা আর খাঁটি কবিতাই হইয়া ওঠে না, সে হইয়া যায় সেকেলে প্যান্‌পেনে 'কাব্য',—তাই, হৃদয়াবেগের ব্যঞ্জনকে বারংবার বুদ্ধির ঝাল-মশলায় সম্বরা দিয়া লইতে হয়, পদে পদে খোঁচা দিয়া, ঝাঁকুনী দিয়া 'কাব্যে'র ঝিম ভাঙিয়া দিতে হয় এবং বুঝাইতে হয়,—এ জিনিসটা নেহাৎই 'কাব্য' নয়,—অন্য কিছু। একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, হৃদয়াবেগের মতন বুদ্ধিরও কোন অন্ধ আবেগ নাই; সুতরাং যেখানে বুদ্ধিরই এতখানি চাতুর্য এবং প্রাখর্য, সেখানে দুর্নিবার আবেগের কথাটা তর্কের খাতিরে একটা গালভরা কথা মাত্র। নিরন্তর এত বুদ্ধির প্যাঁচ কষিবার সময় থাকে, শুধু ছন্দ এবং মিল দিবার সময় থাকে না, একথা বলিলেই বা সকলে খুশী মনে শুনিতে চাহিবে কেন?

আসলে কিন্তু আধুনিক কবিতায় সাজান-গুছানোর চেষ্টাটা যে খুবই কম তাহা নহে; তবে সে চেষ্টা প্রাক্-আধুনিক যুগের চেষ্টার খানিকটা বিপরীত। কিন্তু বিপরীত চেষ্টা ত আর অচেষ্টা নয়। একদল লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাঁহারা প্রত্যেক কাজের পূর্বেই পাঁজি দেখেন শুভদিন খুঁজিবার জন্য; আর একদল লোক চাহেন এই কুসংস্কারকে দূর করিতে; কিন্তু সেই কুসংস্কারকে দূর করিতে তাঁহারাও

যদি দেখেন প্রত্যেক কার্যারম্ভের পূর্বেই পাঁজি অশুভদিন খুঁজিয়া বাহির করিতে,—তবে সংস্কার-বর্জনের চেষ্টা সেখানে দেখা দেয় উগ্রতর সংস্কারের রূপে। বর্তমান যুগেও চলিতেছে মরিয়া হইয়া কবিতার ভিতর হইতে এই কাব্য-সংস্কার বর্জনের চেষ্টা,—আর সেই চেষ্টার ভিতরেই আছে সাজানো-গুছানোর অদম্য উৎসাহ। জগতে ও জীবনে যাঁহারা সৌন্দর্য বা রসের নামে খুঁজিয়াছেন সঙ্গতি ও সৌষম্য তাঁহা-দিগকেই শুধু খুঁজিয়া বাছিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া কথা বলিতে হইয়াছে এমন নহে, জগৎ ও জীবনে যাঁহারা অসঙ্গতি ও অসৌষম্যকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও খুঁজিতে বাছিতে বা সাজাইতে গুছাইতে কিছু কম হয় নাই। আধুনিকগণের পক্ষ হইয়া অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, বিশ্বসৃষ্টির অসৌষম্য এবং বিশৃঙ্খলাটাই নিরেট সত্য বলিয়া তাঁহাদিগকে কিছু আর ঢাকাঢাকি চাপাচাপি করিয়া কথা বলিতে হয় না, সংস্কারের চশমা খুলিয়া ফেলিয়া সাদা চোখে একবার বিশ্বসৃষ্টির এই বাস্তব রূপটি দেখিয়া লইতে পারিলেই হয়; পরন্তু প্রতিপক্ষের বক্তব্যটা আসলে মিথ্যা বলিয়া তাহাদের নিরন্তর নিজেদের মতানুযায়ী খুঁজিয়া বাছিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া কথা বলা ছাড়া আর উপায় নাই। আসলে কিন্তু এই সঙ্গতি-অসঙ্গতি, সৌষম্য-বিশৃঙ্খলা ইহার

কোনটাই একক সত্য নহে,—অনন্ত বিশ্বজীবনের বহুবিস্তৃত পরিধিতে ইহার দুই-ই সত্য; একনিষ্ঠ পক্ষসমর্থক হইয়া আমরা যখন ইহার যাহারই জয়কীর্তন করিতে আরম্ভ করি, তখনই আমাদের আশ্রয় লইতে হয় খোঁজাই-বাছাইয়ের, সাজানো-গুছানোর। অধিকন্তু যাহারা চিরাচরিত প্রথার বশবর্তী হইয়া নানা সুগন্ধি প্রসাধন এবং কেশবিন্যাসের দ্বারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে, তাহাদের পন্থাটা অনেকখানি সহজ; কিন্তু সযত্নে রচিত এলোমেলো চুলে উস্ক-খুস্ক রূপের দ্বারা যাহাদিগকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়, তাহাদের পন্থাটি অনেক কঠিন!

আধুনিক কাব্যরীতির জীবন-ইতিহাসের গোড়ার কথাটা কিন্তু এই সকল স্বপক্ষীয় যুক্তির ভিতরে নাই,—বিপক্ষীয় যুক্তির সারবত্তার ভিতরেও তাহার আশু বিনাশের কোন ভয় আছে বলিয়া মনে করি না। সোজা ভাবে ধরা যাক, আধুনিক কবিতায় প্রচলিত ছন্দের কথা এবং বিশেষ করিয়া মিলের প্রথা বর্জনের কথা। আমার মনে হয়, সে সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, আমরা বহু দিন—বহু শতাব্দী ধরিয়া কবিতায় নিখুঁত ছন্দ করিয়াছি—একেবারে নিক্তিতে ওজন করা মাত্রা-মাপা ছন্দ; বহুদিন ধরিয়া দিয়াছি মিল; তাহার অস্তিত্বের পশ্চাতে যত প্রকাণ্ড তত্ত্বই থাক না কেন, আজ

যেন তাহা আর ভাল লাগিতেছে না। আমাদের বর্তমান জীবনের উপর দিয়াও অনবরত চলিতেছে যে এলোমেলো ঝড়-ঝাপ্‌টা তাহার সহিতও কাব্যের সুকুমার ছন্দ ও মিলের খুঁজিয়া পাইতেছি না সঙ্গতি। কাব্যের ক্ষেত্রে এই ভাল-লাগা না-লাগাটাই সব চেয়ে বড় কথা। এই জন্যই মনে হয়, আধুনিক যে কাব্যরীতি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে সেও সত্য,—সে নিছক ব্যভিচার নহে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কবিতায় অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল নিখুঁত ছন্দ,—নিখুঁত মিল দিয়া আসিয়াছেন ; তাঁহার কাব্য-রচনায় ছন্দ ও মিলের সৌকর্য যেন লাভ করিয়াছে একটা চরম পরিণতি। সেই পরিণতির পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই খুঁজিতেছিলেন বৈচিত্র্য,—মুক্তক ছন্দের ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া তিনি নিজেই আসিয়া পৌঁছিলেন গদ্য-কবিতায়। আর গদ্য-কবিতাকে এমন ভাবে বাঙলা-সাহিত্যে প্রচার করিবার সাহস অনেকখানি তিনি নিজেই দিয়াছেন আধুনিক রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি-দিগকে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কাব্য-জীবনেই এই কাব্যরীতির পরিবর্তনের কারণ তাঁহার তত্ত্ববুদ্ধির পরিবর্তন নহে,—ওটা যেন অনেকখানি নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া—বৈচিত্র্যের এবং নূতনত্বের চাহিদায় এবং যুগের বুকে বাজিয়া উঠিতেছে যে বেসুর তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য। এই যে

আধুনিক কবিতায় হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য, অথবা হৃদয়-বৃত্তিকে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া পরিবেশনের চেষ্টা ইহার পশ্চাতেও রহিয়াছে ঐতিহাসিক কারণ। ইউরোপে রোম্যান্টিক্‌বাদ প্রবর্তিত হইয়াছিল অনেকখানি বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়, আবার সেই বুদ্ধিবাদের প্রধান্য জাগিয়া উঠিতেছে রোম্যান্টিক্‌বাদের বিরুদ্ধে আমাদের মনের প্রতিক্রিয়ায়। বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত রোম্যান্টিক্ সুরের মোহে আমাদের মন যেন আসিতেছিল ঝিমাইয়া,—আধুনিক কবিতা বুদ্ধির ধাক্কা দিয়া আবার চেষ্টা করিতেছে আমাদের মনকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য। আর সেই বুদ্ধির ধাক্কার জন্যে প্রয়োজনও ছিল বর্তমান কবিতার আধুনিক রীতির। কিন্তু ললিতছন্দ বা নিখুঁত মিল যে একেবারেই কবিতার জগৎ হইতে বিদায় লইল, একথা মনে করায় আমাদের সাময়িক আত্ম-প্রসাদ লাভ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য বেশী নাই। আবার হয়ত আসিবে সুনিপুণ ছন্দ, সুকুমার মিল,—সেদিন আস্তে আস্তে আমাদের যুক্তির ধারাও যাইবে আবার একটু একটু করিয়া ফিরিয়া,—ঐ ছন্দ, মিল, কবিতার কমনীয় লাস্যবিলাসের ভিতরেই আমরা আবার সন্ধান পাইব গভীর তত্ত্বের।

আমি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের তত্ত্বালোচনার

প্রয়োজনীকে এতটুকুও লঘু করিতে চাহিতেছি না, অথবা এমন কথাও বলিতে চাহি না যে, বিভিন্ন যুগের পরিবর্তনশীল সাহিত্যাদর্শের ভিতর দিয়া সাহিত্যের সাধারণ স্বরূপ বলিয়া কোন কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, সহিত্যের তত্ত্বালোচনা অতীত এবং বর্তমান সাহিত্যকে বুঝিতে আমাদিগকে যতখানি সাহায্য করে, ভবিষ্যৎ সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে ঠিক ততখানি সাহায্য করে না। ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলে একটা সতেজ প্রাণ-ধর্ম—বুদ্ধির দ্বারা সেই প্রাণধর্মকে বুঝিতে যাওয়া যত সহজ, তাহাকে প্রতিপদে নিয়ন্ত্রিত করা তত সহজ নহে,—নিরাপদও নহে! সাহিত্যের এই প্রাণধর্মের পশ্চাতে রহিয়াছে এক বিরাট ইতিহাসের পটভূমি; সেই পটভূমি হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সাহিত্যের প্রাণধর্মের উপরে অনেকটা করা হয় অবিচার। প্রাণের উপরে বুদ্ধির অভিভাবকত্ব দরকার এ কথা সর্বদেশে এবং সর্বকালে স্বীকার্য; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রাণ-প্রবাহের গতিকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারে না; সে প্রবাহকে সৃষ্টিও করিতে পারে না। এই জন্যই প্রতিভা জিনিসটিকে আমাদের বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমাদের আলঙ্কারিক

জগন্নাথ বলিয়াছেন, কাব্যোৎপত্তির একমাত্র কারণ কবি-প্রতিভা,—"তস্য চ কারণং কবিগতা প্রতিভা।" আর পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রতিভার লক্ষণ "অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উঠিবে,—সাহিত্যের আকৃতি এবং প্রকৃতি যদি দেশ-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এতখানি পরিবর্তনশীল হয়, তবে কি সাহিত্যের শাশ্বত-স্বরূপ বলিয়া কোন জিনিস নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে,—আদিম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত আমরা যদি মানুষের ইতিহাস বিচার করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব,—ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি গিয়াছে অনেকখানি বদ্‌লাইয়া, কিন্তু তথাপি মানুষ নামক জীবটি বদলাইয়া অন্য জীব হইয়া যায় নাই; তাহার কারণ, প্রতিমুহূর্তের হাজার রকমের পরিবর্তনের ভিতরেও মানুষের ভিতরে রহিয়াছে কতগুলি মৌলিক অপরিবর্তিত সত্য, যাহার সমবায়কে আমরা বলি মনুষ্য-সাধারণের স্বরূপ। সেইরূপ সাহিত্য-সাধারণেরও একটা অপরিবর্তিত স্বরূপ আছে, যাহা দেশকালের ব্যবধানকেও এড়াইয়া সমস্ত সাহিত্যের ভিতরে স্থাপন করিতেছে একটি যোগসূত্র। আত্মবাদিগণ এই শাশ্বত স্বরূপকেই বলিবেন সাহিত্যের আত্মা। কিন্তু ব্যবহারিক

ক্ষেত্রে যেরূপ মানুষের এই শাশ্বত আত্মার সম্বন্ধে দিনের পর দিন শুধু মতবাদই গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু আত্মার স্বরূপ এখন পর্যন্তও কেহ নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই। কিন্তু মানিয়া লইলাম যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্নকালের রচিত সকল সাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তাহার শাশ্বত স্বরূপটি আবিষ্কার করা সম্ভব; কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্যের এই গতিধর্মের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় বলিয়া মনে হয় না। বাহিরের জগতে মানুষের সহিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের যত কারবার তাহা তাহার অন্তরবস্থিত কূটস্থ আত্মাকে লইয়া নহে, তাহার নিত্যপরিবর্তনশীল দেহ ও মনকে লইয়া; সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রত্যক্ষ সকল কারবার এই পরিবর্তনশীল দেহধর্ম ও মনোধর্ম লইয়া, তাহার শাশ্বত স্বরূপ লইয়া নহে। তত্ত্ববুদ্ধির সাহায্যে সর্বজনীন এবং সর্বকালিক সাহিত্যের একটি অচল স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া তাহাকে মন্দিরে স্থাপন করিয়া তারস্বরে স্তুতিগান করা চলিতে পারে; কিন্তু সে 'স্বরূপের' কোন 'রূপ' নাই, তাই তাহার সহিত মানুষের হৃদয়েরও কোন আদান-প্রদান নাই; হৃদয়ের আদান-প্রদান যে সাহিত্যের সহিত তাহার নিরুদ্দেশ-যাত্রা মহাকালের রথে, দুর্বার তাহার সেই আনন্দ-যাত্রা।

আর্টে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন

বিশ্বসৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট সৌন্দর্যশিল্পী যখন তাহার আবেদন জানাইয়াছিল,—

আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

তখন দেবী প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কি কাজে লাগিবি?

সৌন্দর্যশিল্পী উত্তর দিল,—

অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন।

আর্টসৃষ্টি [illegible] 'অকাজের কাজ',—'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়',—ইহাই আর্টের মূলপ্রকৃতি এবং ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত মত। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় এবং প্রবন্ধে এই মতটিকে নানাভাবে প্রকাশ এবং প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্টের আনন্দ একান্ত 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' রবীন্দ্রনাথের 'অনাবশ্যক' কবিতাটির ভিতরে দেখিতে পাই,—

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি এসে সুধাই তা'রে ডেকে
"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে,
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল "ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।"
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে॥

সৌন্দর্য-পূজারীর সকল সৌন্দর্যসৃষ্টি এমনি করিয়া অকারণেই ভাসিয়া যায়, আমাদের এই 'কাজের জগতে'র কোনো কাজেই সে আসে না। আমরা তাহাকে দিয়া আমাদের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালাইবার যতই চাহিদা জানাই, কবিমন বা শিল্পিমন তাহাতে সাড়া দিতে চাহে না; সে যে আলো জ্বালায় তাহা কোনো ঘরের অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য নহে,—গোধূলির অন্ধকারে শূন্যনদীর কূলে কাশবনের কোল ঘেঁষিয়া একাকী কাঁপিয়া ভাসিয়া যাইবার

জন্যই তাহার সৃষ্টি ; সে ভাসিয়া যায় অকারণে, অপ্রয়োজনের আনন্দে। কবি বা শিল্পী যে শুধু বাহিরের জগতের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, লাভ-লোকসানের দিকেই তাকায় না তাহা নহে,—আপন সৃষ্টির ভিতরে তাহার নিজেরও কোন স্বার্থবোধ নাই। সুন্দর যেদিন সৃষ্টির রাজপথে আসিয়া দেখা দেয় 'রাজার দুলালে'র বেশে,—সুন্দরের পূজারিণী সেদিন তাহার 'বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া' থাকিতে পারে না। সে মণি হয়ত কেহই কুড়াইয়া লয় না,—রথচক্রের নিষ্পেষণে সে হয়ত গুঁড়া হইয়া মিলিয়া যায় রাজপথের ধূলার সঙ্গে,—কিন্তু তথাপি 'রাজার দুলালে'র যে রহিয়াছে অমোঘ আকর্ষণ !

ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি' মোর ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি' নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি' মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধূলার পরে ॥

মাগো, কী হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে চাহিস্
কিসের তরে।

মোর　হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
　　রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
　　চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে প'ড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি　কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ
　　　　ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু　রাজার দুলাল গেল চলি' মোর ঘরের সমুখপথে,
মোর　বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব
　　　　বল কী মতে॥

কিন্তু এই 'অপ্রয়োজনের আনন্দে'র তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই যে, আমাদের সকল সাহিত্য এবং সুকুমার কলাসৃষ্টির পশ্চাতে থাকে যে প্রেরণা, তাহা আমাদের নিছক জৈবধর্মের অন্তর্গত নহে। আমাদের যে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি এবং তাহাব জন্য জাগিয়া ওঠে যে জীবন-সংগ্রাম তাহার ভিতরে জড়াইয়া গিয়া পৃথিবীর ধূলোকাদায় লুটোপুটি করিতে আর্ট নারাজ। আমাদের বিশুদ্ধ জৈবিক অস্তিত্বের প্রবাহ চারিদিকে জাগাইয়া তুলিতেছে সহস্র রকমের অভাব-অভিযোগ—সহস্র রকমের প্রয়োজন; আমাদের বিশুদ্ধ আর্টসৃষ্টি এই জৈবিক প্রয়োজন-সিদ্ধিতে আমাদের কোন কাজেই আসে না, তাহাকে আমরা পাই আমাদের জৈবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত রূপে, তাই

তাহাকে অনেক সময়ে বলা হইয়াছে আমাদের বাস্তব জীবনের একটা 'উপরি পাওনা'। যেমন, জলতৃষ্ণা মানুষের জৈবিক ধর্মের অন্তর্গত, সেই জৈবিক ধর্মের চাহিদায় প্রয়োজন হইল একটি জলপাত্রের ; এই যে জলপাত্রের সৃষ্টি তাহা আমাদের জৈবিক প্রয়োজন-সিদ্ধির প্রেরণায় সৃষ্টি,—সুতরাং তাহাকে আমরা আর্ট বলি না। কিন্তু মানুষ সেইখানেই থামে নাই,—সে সেই জলপাত্রকে দান করিয়াছে লক্ষ রকমের আকৃতি,—তাহার দেহ সে ভরিয়া দিয়াছে নিপুণ রেখায় রেখায়—রঙে রঙে। এই যে রেখায়, রঙে—বহু বিচিত্র আকৃতির ভিতর দিয়া চলিয়াছে সুন্দরের সাধনা, তাহা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য নহে, তাহার সৃষ্টিরহস্য জাগিয়াছে আমাদের তৃষ্ণার চাহিদাকে অনেকখানি ছাড়াইয়া—তাই সে আর্টসৃষ্টি।

আর্টের যথার্থধর্ম সম্বন্ধে এই মতাবলম্বিগণের মতে আর্ট যে বহুযুগের ক্রমবিবর্তনের বা ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়া অনেক পরবর্তী কালে এই জাতীয় একটি প্রয়োজন-নিরপেক্ষ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে তাহা নহে,—ইহাই আর্টের মৌলিক ধর্ম। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিয়াও একথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, প্রথমে আমাদের সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধ আমাদের বাস্তব প্রয়োজনবোধগুলির সহিতই

অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়াছিল এবং ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়াই ইহাদের ভিতরে ঘটিয়াছে ক্রমবিচ্ছেদ,—এবং আজ তাহারা দাঁড়াইয়াছে সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকখানি অন্যোন্য-নিরপেক্ষ রূপে; ইহাদিগের মধ্যে আর্টের ইতিহাসের পশ্চাতে রহিয়াছে 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়।' জীবনের প্রথম দিন হইতেই চলিতেছে মানুষের অবিশ্রান্ত জীবন-সংগ্রাম; সেই কঠোর জীবন-সংগ্রামের মাঝখানে থাকিয়া সে যতক্ষণ শুধু সংসার-চক্রে পাক খাইয়াছে, ততক্ষণ সে জানিতে পারে নাই যে, নিছক বাঁচিয়া থাকিবার অতিরিক্ত জীবনের আরও কোন সার্থকতা আছে। এই কর্মের ভিড় ঠেলিয়া সহসা কোনো শুভ মুহূর্তে দেখা দিয়াছিল সুন্দরের সোনার রথ প্রভাতের এবং সন্ধ্যার গায়ে গায়ে,—নিম্নের শ্যামল সবুজ ধরণীর গায়ে গায়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার আরক্ত আভা,—জীবনের বদ্ধ কুঠরি হইতে অবসরের বাতায়ন-পথে আসিয়াছিল এই সুন্দরের আহ্বান;—মানুষ বলিল,—এই ইস্পাতে আঁটা কাজের জীবনটাই আমার সব নয়, আমার আরও অনেক কিছু আছে এই লৌহকুঠরির বাহিরে; এইখানেই আর্টের প্রথম উদ্বোধন। তাহার পর হইতে পৃথিবীর বুকে পাশাপাশি চলিয়াছে দুইটি ধারা,—একটি পাষাণপুরীর অন্ধকারে দিনরাত্র মাটি খুঁড়িবার ধারা, সেটা

নেহাৎই বাঁচিয়া থাকিবার দুর্বার স্পৃহায়,—অপরটি কাজের জগৎ হইতে ছুটি লইয়া 'মালঞ্চের মালাকর' হইবার আবেদন।

আর্টের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজকার দিনে আমাদেব অনেক কিছু বলিবার আছে। প্রথমতঃ, বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক এবং বৈশ্লেষিক দৃষ্টিতে আর্টের এই জন্ম-বৃত্তান্তকেই অনেকে সম্পূর্ণরূপে মানিতে রাজি হইব না। সৌন্দর্যের শতদল যে নিরালম্ব হইয়া আকাশে ঝুলিতেছিল, অথবা "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" আদিম বসন্তপ্রাতের উর্বশীর ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এমন কথা স্বীকার করা যায় না। সে হয়ত ফুটিয়া উঠিয়াছে অনেকখানি পাঁক ঘাঁটিয়া,—সেই পঙ্কের ইতিহাস আজ হয়ত ঢাকা পড়িয়াছে তত্ত্ববারির ব্যবধানে। নর হয়ত প্রথম সুন্দর দেখিয়াছিল নারীকে, নারী দেখিয়াছিল নরকে; পরস্পরের এই সৌন্দর্যবোধের উন্মেষের ভিতরে ছিল হয়ত অতনু পঞ্চশর। আদিযুগের সেই দেখার আজও হয়ত বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই,—সুন্দরের মন্দিরে চিরন্তন কালের জন্যই নর করিয়াছে নারীর পূজা,—এই বিংশ শতাব্দীতেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই দেখিতে পাইতেছি,—Poetry is woman,—অর্থাৎ কাব্য

আর নারী এক। রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী' কবিতাটিতে উর্বশীকে যতই নিছক নারীসৌন্দর্যের প্রতীক করিয়া আকিতে চেষ্টা করুন না কেন, সে যে কখন গিয়া বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতীক হইযা দাঁড়াইয়াছে কবি নিজেই হয়ত তাহা জানিতে পারেন নাই। যে উর্বশী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিদিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।

কবি একই নিঃশ্বাসে সেই উর্বশী সম্বন্ধে আবার বলিয়াছেন—

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করে পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী।
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল—" ইত্যাদি।

এই যে নিছক নারী-সৌন্দর্যের মুহূর্ত মাঝে বিশ্ব-সৌন্দর্যের রূপ গ্রহণ, ইহার বিশুদ্ধি সম্পর্কে মতানৈক্যের অবসর

থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিবেন, এ সত্য শুধু মনুষ্যজগতের সত্য নহে, ইহা সমগ্র জীবজগতের সত্য। সৌন্দর্যবোধ না থাকিলে সৃষ্টিরক্ষা ব্যাপারেই পড়িত বাধা; ওটা হয়ত তাই অব্যাহত সৃষ্টি-প্রবাহের জন্য বিশ্ব-প্রকৃতির আপনারই আয়োজন। কথাটাকে কেহ কেহ আবার উল্টা করিয়াও বলিয়াছেন, এবং সে বক্তব্যটিকে নিরাভরণ রূপে প্রকাশ করিলে দাঁড়ায় এই যে, যাহা যৌনরসের পরিপোষক আমাদের মনের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাহাকেই আমরা বলি সুন্দর। জীবনের এই স্থূল বোধগুলির চাহিদায়ই সূক্ষ্ম বোধ-গুলি ক্রমে ক্রমে উৎসারিত হইয়াছে। আজ তাহাদের গায়ে নিরন্তর তত্ত্বের গঙ্গাজল ছিটাইয়া যতই তাহাদিগকে দেব-মন্দিরের অনবদ্য উপচার করিয়া তুলি না কেন, তাহাদের স্বরূপ এই বিংশ শতাব্দীতেও বিশেষ কিছুই বদলায় নাই।

কথাগুলিতে প্রথম ধাক্কাতেই মন ওঠে বিরূপ হইয়া, কিন্তু সেটা হয়ত ততখানি যুক্তির প্রাতিকূল্য বশতঃ নয়, যতখানি সংস্কারের প্রাতিকূল্য বশতঃ। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বর্তমান কালে মনঃসমীক্ষণকারীর দল খুঁচিয়া খুঁচিয়া পাঁক ঘাঁটিয়া আর্টের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতেছে তাহা

আর্টের বিশুদ্ধরূপের স্বরূপ নহে; বিমিশ্র এবং বিকৃতরূপের লক্ষণ লইয়া আর্টের স্বরূপ বা স্বধর্ম নির্ধারণ করিতে গেলে আমাদিগকে সত্য হইতে অনেকখানি দূরে থাকিতে হইবে। কিন্তু এই জাতীয় যুক্তির দ্বারা প্রকৃত সমস্যাকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই; কারণ আর্টের যে নিরালম্ব অবিমিশ্র বিশুদ্ধ স্বরূপটির কথা আমরা বলি, তাহা অনেকখানিই একটা তাত্ত্বিক সত্য মাত্র, বাস্তবে তাহার অস্তিত্ব একান্ত দুর্লভ; সুতরাং আর্টের যে রূপ লইয়া আমাদের সদা-সর্বদা কাজ-কারবার, সেই রূপটি লইয়াই আলোচনা হওয়া দরকার।

আজকাল যে সকল জীবতত্ত্ববিদ্ ও মনঃসমীক্ষণকারীর আবির্ভাব ঘটিতেছে, তাঁহারা সযত্নরক্ষিত উদ্যানের মাটি খুঁড়িয়া সাপ বাহির করিতে জানেন। আমরাও যে সব সময় তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি তাহা বলা যায় না। আমরা এখানে জীবতত্ত্ববিদ্ বা মনঃসমীক্ষণকারীদের সহিত তর্কযুদ্ধের অবতারণা করিতে চাহি না; তাঁহাদের বলিবার কথা আছে অনেক,—আর প্রতিপক্ষকেও যে একেবারে নিরুত্তর থাকিতে হয় এমন নহে। কিন্তু কাহারও প্রতি-পাদ্যকে অস্বীকার না করিয়াও এ কথা বলা চলে যে, পূর্ণ প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদল পঙ্কজাত বলিয়াই পঙ্কধর্মী নহে।

শতদলের জীবনধর্মের ভিতরে এমন কিছু রহিয়াছে যাহা পঙ্কধর্ম হইতে অনেকখানি পৃথক্‌,—তাই পঙ্কের দুর্গন্ধী কুশ্রীতার ভিতরে শিকড় প্রসারিত করিয়াও সে শতদলের অপরূপ সৌন্দর্য-মাধুর্যকে প্রকাশ করে। কর্দমাক্ত জীবনের ক্লিন্নতার ভিতরে থাকিয়া সে করে বহুদূরস্থিত সূর্যের উপাসনা, সেখান হইতে সংগ্রহ করে তাহার বর্ণসম্ভার। আমাদের সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধের শতদলও হয়ত ঠিক তেমনি শিকড় প্রসারিত করিয়া আছে অসংখ্য স্থূল প্রয়োজনের ভিতরে,—সেখান হইতেই সে সংগ্রহ করে তাহার সকল উপজীব্য; কিন্তু তথাপি আমরা একথা স্বীকার করিতে পারি না যে, আমাদের সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধ লৌকিক পদার্থ। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কাব্যরস লোকোত্তর পদার্থ। জৈবিক প্রয়োজনের সহিত নিরন্তর যুক্ত থাকিয়াও সে নিজের ভিতরে ফুটাইয়া তোলে তাহার স্বতন্ত্র স্বরূপকে, দৃষ্টি তাহার অসীমে—রূপ সংগ্রহ করে সে চন্দ্রসূর্য গ্রহ-নক্ষত্র হইতে। এইরূপে লৌকিক হইতে নিরন্তর লোকোত্তরে যাত্রাই আর্টের স্বধর্ম।

কিন্তু এইখানেই ওঠে আর একটা বৃহত্তর প্রশ্ন। মানুষের মনের বৃত্তিগুলিকে যদি আমরা এইরূপ স্পষ্টভাবে লৌকিক

এবং লোকোত্তরে ভাগ করিয়া রাখি এবং আর্টকে যদি বিশুদ্ধ লোকোত্তর বস্তু বলিয়া বর্ণনা করি, তবে বাস্তব জীবনের সহিত আর্টের সম্পর্ক থাকে কতটুকু? বাস্তব জীবনের অনেক উর্ধ্বে মণিবেদিকায় প্রতিষ্ঠিত আর্টের এই তত্ত্বময়রূপকে দূর হইতে প্রণাম করা চলে, বর্তমান যুগের আমাদের বাস্তবপন্থী মন তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবে কেমন করিয়া?

প্রশ্নটিকে আপাতদৃষ্টিতে যতখানি তরল বা প্রাকৃত-জনোচিত বলিয়া মনে হয়, একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, প্রশ্নটি ততখানি তরল বা অবান্তর নহে। সৃষ্টির ভিতরে প্রকৃতি জীবনের কোনো বাহুল্যকেই কোথাও স্বীকার করে নাই। কালচক্রের ক্রমবিবর্তনের একটা প্রধান কাজ ক্রমে ক্রমে বাহুল্যবর্জন। মানুষের জীবনে আর্ট জিনিসটি যদি একান্ত বাহুল্য হইত তবে প্রাকৃতিক নিয়মে এতযুগ ধরিয়া তাহার টিকিয়া থাকাই উচিত ছিল না। কিন্তু সে যে যুগ যুগ ধরিয়া শুধু টিকিয়া আছে তাহা নহে, দিন দিন সে নিজকে মানুষের জীবনে গভীর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে স্বতন্ত্র মাহাত্ম্যে; তাহাতেই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, মানুষের জীবনে সে বাহুল্য নয়—সে অপ্রয়োজনের নয়—তাহার প্রয়োজন বিরাট্‌তর, গভীরতর, মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথ চিরকাল আমাদের সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধকে 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে সে ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছে। আপত্তিকারীদের মোটামুটি বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যসৃষ্টির ভিতরে বাস্তব জীবনকে সর্বদা পাশ কাটাইয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে তাই সত্যিকারের জীবনের স্পর্শ অপেক্ষা ভাবময় জীবনের বিলাসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই কবিধর্মের জন্যই তিনি আর্টকেও সর্বদা বাস্তব জীবন হইতে বহুদূরে সরাইয়া রাখিয়া তাহাকেও ভাববিলাসী করিয়া তুলিয়াছেন। আর্টকে এতখানি অপ্রয়োজনের রাজ্যে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টার ভিতরেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে কবির কল্পনাবিলাসের প্রাধান্য। আর্টের ধর্মকে বাস্তব জীবন হইতে এতখানি দূরে দূরে সরাইয়া রাখিলে, জীবনের সহিত তাহার নিবিড় সংযোগসূত্র খুঁজিয়া পাইব কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে এই অভিযোগ সত্য কি না এ প্রসঙ্গে সে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ যেরূপভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের জগতের সীমারেখা টানিয়া আর্টকে প্রয়োজনের জগৎ হইতে একেবারে ছাঁকিয়া তুলিয়া অপ্রয়োজনের জগতের বিশুদ্ধ সামগ্রী

করিয়া তুলিয়াছেন সেখানে সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। জীবনের ভিতরে এইরূপ স্পষ্টভাবে কোন প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের সীমারেখা টানা যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজন শব্দ দুইটি সাধারণতঃ দুইটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়োজন বলিতে তিনি মনে করিয়াছেন নিছক বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত সকল স্থূল প্রয়োজনকে, আমাদের বিশুদ্ধ জৈবিক সত্তার প্রয়োজনকে, তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাহাকেই তিনি অপ্রয়োজনের কোঠায় ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগের ভিতরেও বিপদ আছে ; অর্থাৎ কোন্ জিনিসটি যে নিছক আমাদের জৈবিক সত্তার জন্য প্রয়োজন এবং কোনটি তদতিরিক্ত ইহার বিচার করা বড় শক্ত। রবীন্দ্রনাথেরই একটা সিদ্ধান্ত লওয়া যাক। পূর্বেই দেখিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, জল আমাদের জৈবিক সত্তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু এবং এই জন্য জলপাত্রটিও আমাদের জৈবিক প্রয়োজনের অন্তর্গত ; কিন্তু এই জলপাত্রের যে অসংখ্য সূক্ষ্ম কারুকার্যময় আকৃতি—তাহার গায়ে যে বর্ণে বর্ণে রেখায় রেখায় জাগিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র চিত্রাঙ্কন, ইহা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অপরিহার্য নহে। অতএব ইহারা অপ্রয়োজনের আনন্দে সৃষ্ট আর্ট। কিন্তু যে কোন

পাত্রে জল সরবরাহ করিলেই প্রত্যেক মানুষের জলতৃষ্ণা যে একই ভাবে নিবারিত হয়, এই কথাটিকেই আমরা সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে রাজি নই। যে জলপাত্রের জলে যে কোন সাধারণ লোকের তৃষ্ণা নিবারিত হয়, সেই জলপাত্রের জলে রবীন্দ্রনাথের জলতৃষ্ণাও সেইরূপভাবে নিবারিত হইবে একথা মানিব না। জলপাত্রের মনোরম আকৃতি তাহার সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের জলতৃষ্ণা নিবারণের পক্ষেই সহজে পরিহার্য নহে; সুতরাং সেটা একান্ত 'উপরি পাওনা'ও নহে। কলিকাতার বড়বাজারের ঘিস্‌ঘিস্‌ করা সঙ্কীর্ণতম গলিতে আলো হাওয়া-বিহীন একটি কুঠরি বাসস্থান হিসাবে একটি ব্যবসায়ীর পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিছক জৈবিক সত্তার জন্যও ঐ স্থানটি যথেষ্ট নহে; শান্তিনিকেতনের আবেষ্টনীর ভিতরে 'উত্তরায়ণে'র 'শ্যামলী' বা 'পুনশ্চ'তে বাস বড় বাজারের ব্যবসায়ীর পক্ষে যতখানিই 'উপরি পাওনা' হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের জৈবিক সত্তার জন্যও তাহা একান্ত অপরিহার্য। এখানে কেহ সাম্যবাদের দোহাই দিলে বলিতে হইবে, এখানে সাম্যবাদকে অনর্থক একটা অনুচিত সীমায় টানিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র।

আসল কথা এই. মানুষের ভিতর হইতে জীব-সাধারণ রূপে আমরা মানুষের যে একটা সর্বজনীন এবং সর্বকালিক

জৈবিক সত্তার ধারণা করিয়া লইয়াছি, মূলে সেই ধারণাটাই ভুল। জীব হিসাবে আমাদের সকলের জৈবিক সত্তা এক নহে। আমাদের জৈবিক প্রবাহ যে শুধু অন্নধর্ম এবং প্রাণ-ধর্ম লইয়া এই বিশ্বাসটাই সত্য নহে। দেহের ভিতরে অন্নধর্ম, প্রাণধর্ম এবং মনোধর্মকে পৃথক্ করিয়া লওয়া শুধু কষ্টসাধ্য নহে—অসাধ্য। এই জন্যই প্রাণের প্রয়োজন এবং মনের প্রয়োজনকেও সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না,—আমাদের সমস্ত প্রয়োজন-বোধের ভিতরে তাহারা থাকে অভিন্নরূপে পরস্পর জড়িত হইয়া। তাই আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের দেহের ক্ষুধা না মিটাইলেও আমরা যেমন বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, মনের ক্ষুধা না মিটাইয়া শুধু দেহের ক্ষুধা মিটাইয়াও আমরা তেমনি বাঁচিয়া থাকিতে অক্ষম।

এই জন্যই দেখিতে পাই, আমাদের শাস্ত্রে আমাদের জীবসত্তার ভিতরে পাঁচটি কোষের কথা বলা হইয়াছে,—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। আমরা উপরে যে প্রয়োজনের জগৎ এবং অপ্রয়োজনের জগতের কথা বলিয়াছি সেদিক হইতে ভাগ করিলে বলিতে হয়, অন্নময় এবং প্রাণময় কোষের যাহা প্রয়োজন, তাহাই আমাদের প্রয়োজন, আর মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের যে প্রয়োজন

তাহাই আমাদের 'উপরি চাহিদা',—তাহা যেন হইলেও হয়, না হইলেও হয়। আমাদের শাস্ত্রও সে কথা স্বীকার করিবে না। মন, বিজ্ঞান, আনন্দকে বাদ দিয়া আমরা যে বাঁচিয়া থাকিতে পারি একথা শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিবে। আমাদের সমগ্র জীবসত্তার ভিতরে সকল কোষেরই স্থান রহিয়াছে, তাই প্রয়োজনও রহিয়াছে। এই কোষের তারতম্যেই জীবসত্তার ভিতরেও আসে তারতম্য,—যেমন তারতম্য পশুতে ও মানুষে। পশু বাস করে তাহার অন্নময় ও প্রাণময় কোষে, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের বিশেষ কোন উন্মেষ ঘটে নাই তাহার ভিতরে। এই কারণেই অন্নময় ও প্রাণময় কোষের চাহিদা মিটিয়া গেলেই সে খুশী—সেই খুশীতেই বাঁচিয়া থাকে তাহার জৈবিক সত্তা। মানুষের জগতে আসিয়া খুলিয়া গিয়াছে অন্ন ও প্রাণের উপরে মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের খেলা, সে তাই শুধু অন্ন ও প্রাণের চাহিদা মিটাইয়াই খুশী নহে, তাহার রহিয়াছে মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের চাহিদা। সকল মানুষের ভিতরেই যে সকল কোষগুলি সমান উন্মেষ লাভ করে তাহা নহে,—সাধারণ মানুষ ব্যস্ত তাহার অন্ন ও প্রাণ লইয়া, সে প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই সেও খুশী। কিন্তু যে মানুষের ভিতরে খুলিয়া গিয়াছে সেই মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দ লোক, জাগিয়া

উঠিয়াছে অসংখ্য মনের প্রয়োজন, বিজ্ঞানের প্রয়োজন, আনন্দের প্রয়োজন, তাঁহাকে আমরা কি করিয়া বাঁচাইয়া রাখিব শুধু অন্ন এবং প্রাণের খোরাক জোটাইয়া? তাঁহার পক্ষে অন্নের চাহিদা ও প্রাণের চাহিদা যত বড় প্রয়োজন, যত বড় সত্য,—মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের চাহিদাও তত বড় প্রয়োজন, তত বড় সত্য। এই মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দের চাহিদাতেই জাগে মানুষের সকল সুকুমার বৃত্তি—তাহার সৌন্দর্যবোধ, রসবোধ, ধর্মবোধ, শ্রেয়োবোধ,—এইখানেই আমাদের সমগ্র সত্তার সহিত সকল সাহিত্য ও কলাসৃষ্টির নিগূঢ় সংযোগ। রবীন্দ্রনাথের ভিতরে রহিয়াছে যে সত্যিকারের কবিসত্তা—যে মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের খেলা—তাহার পক্ষে ভাত, ডাল, রুটি, তরকারী যতখানি প্রয়োজনীয়, সাহিত্য, শিল্প, নৃত্যগীত—তরুলতা বেষ্টিত ছায়ানিবিড় আবেষ্টনী--উদার প্রান্তর—উন্মুক্ত আকাশ—ইহার প্রত্যেকটিই ততখানি প্রয়োজনীয়। মানুষের জীবসত্তার ভিতরে উন্মেষিত হইয়া ওঠে যেই কবিসত্তা তাহার পক্ষে এই সকল কিছুই তাই বাহুল্য নহে, ইহারাই তাহার বৃহত্তর এবং মহত্তর জীবনের উপজীব্য। আমাদের পাশব সত্তার চাহিদাকে যদি আমরা প্রয়োজন বলিয়া আমাদের সেই মহত্তর সত্তার দাবী-দাওয়াকে অনাবশ্যক বা বাহুল্য আখ্যা প্রদান করি,

তবে মানুষের সমগ্র অস্তিত্বকে আমরা করিব প্রকাণ্ড অপমান।

আমাদের ‘প্রয়োজন’ কথাটার কোনও নিরপেক্ষ অর্থ নাই,—কথাটা মূলতঃই আপেক্ষিক। এই একান্ত আপেক্ষিক শব্দটির সাহায্যেই যখন আমরা সাহিত্য বা সাধারণ আর্টের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাই, তখন ভ্রান্তি এবং সংশয়ের অবকাশ থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের স্থূল সত্তার প্রয়োজন এবং আমাদের সূক্ষ্ম সত্তার প্রয়োজন এক নহে,—কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের স্থূল সত্তার প্রয়োজনই প্রয়োজন, আর সূক্ষ্ম সত্তার প্রয়োজন সবই অপ্রয়োজন এরূপ কথা বলারও কোন সার্থকতা নাই। আমাদের জীবনের স্থূল অংশটা এবং সুকুমার অংশটাকে আমরা যেভাবে স্পষ্ট করিয়া পৃথক্ করিয়া লইতে চাই বিধাতা-পুরুষ তাঁহার সৃষ্টিকে তেমন করিয়া ভাগ করিবার সুযোগ রাখেন নাই; নিশ্চয়ই—‘এ দু’য়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল’; এবং সেই মিলের ভিতরেই জাগিয়া ওঠে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত—লৌকিক এবং লোকোত্তরের ভিতরে একটা নিগূঢ় যোগ এবং সামঞ্জস্য। আমাদের এই রক্তমাংসের দেহের ঘরখানিতে প্রেমের বাঁধনে মিলিয়া মিশিয়া ঘর করিতেছে স্থূল-সূক্ষ্মের দম্পতি,—তাহাদের ভিতরে কলহ-বিবাদও রহিয়াছে, আবার

আপনা-আপনি আপোষ-নিষ্পত্তির ভিতরে মিলিয়া-মিশিয়া বাস করিবার মত প্রেমও রহিয়াছে। বাহির হইতে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া তাহাদের ভিতরকার অপ্রেমটাকেই বড় করিয়া দেখাইয়া গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া লাভ নাই।

রবীন্দ্রনাথ আর্টের প্রকৃতিকে যেভাবে অপ্রয়োজনের আনন্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন আর্টের প্রকৃতিকে মোটামুটি বুঝিতে গেলে উহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে আর্টের মতন সূক্ষ্ম জিনিসকে ঐরূপ মোটামুটি বুঝিতে যাওয়ার বিপদ আছে। একটু গভীর ভাবে দেখিতে গেলে দেখিতে পাইব, সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধ মানুষের জীবনে এতটুকুও অপ্রয়োজনীয় নহে,—তাহার ভিতরে আছে মানুষের গভীরতর এবং মহত্তর প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে একথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মানুষের জীবন-লীলার ভিতরে একটা surplus—একটা 'উপরি' জিনিস রহিয়াছে,—সেই surplus মানুষকে তাহার জৈবিক খণ্ডতা হইতে একটা সীমাহীন অখণ্ডতার দিকে নিরন্তর পৌঁছাইয়া দিতেছে। এই দৃষ্টি লইয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, মানুষের যে সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধ তাহা এই surplus রাজ্যের বস্তু। মানুষের ভিতরে যে জীব-সাধারণের অন্নময় কোষ এবং প্রাণময় কোষের অতিরিক্ত একটা বিরাট্‌তর সত্তা রহিয়াছে

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত সকলেই একমত; কিন্তু সেই অন্নময় এবং প্রাণময় কোষের অতিরিক্ত জিনিসগুলি সম্বন্ধে ঐ surplus কথাটার ব্যবহার একটু সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের সমগ্র সত্তার ভিতরে এগুলি কিছুই অতিরিক্ত নহে, তাহারা 'অতিরিক্ত' আমাদের নিম্নতর সত্তার সম্পর্কে। এই দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিলে এই অতিরিক্ত অংশটাকে অতি সহজেই মানুষের বাস্তব জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া দেখিতে পারি। আর্টকে তখন আর বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিছক একটা ভাববিলাস বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা থাকে না; তখন বুঝিতে পারি যে রাজনৈতিক ধ্বস্তাধ্বস্তি বা রক্তারক্তিই 'বাস্তব জীবনে'র 'কাজ' নহে, নিভৃত কোণে বসিয়া চিত্রাঙ্কন বা কবিতা লেখাও জীবনেরই 'কাজ'; সেদিন বুঝিতে পারি, যাহারা অন্ধকার গৃহে আলো জ্বালাইয়া দেয় শুধু তাহারাই কাজ করে না,—লক্ষ দীপের ভিতরে যাহারা শূন্যে আকাশ প্রদীপ তুলিয়া দেয় তাহারাও কাজ করে। অন্ধকারের প্রদীপটিরও যেমন প্রয়োজন আছে,—মানুষের জীবনে আকাশ-প্রদীপেরও তেমনিতর প্রয়োজন রহিয়াছে,—সে 'অনাবশ্যক' হয়ত জীবনের বৃহত্তর—মহত্তর আবশ্যক।

আমাদের পূর্ববর্তিগণ আর্টকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন

অপ্রয়োজনের আনন্দজনিত 'উপরি পাওনা' বলিয়া, আমরা 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর যুগের মানুষ আবার তাহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি; এবং সে প্রতিবাদের একটি বিকৃতরূপ দেখা দিয়াছে আর্টের গায়ে যতখানি সম্ভব নর্দমার দুর্গন্ধী কাদা মাখাইতে,—তাহাতেই যেন প্রমাণিত হইবে যে আর্ট অপ্রয়োজনের ভাববিলাস নহে, সে আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখিতে পাইব যে, উগ্রতম প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া আমরা পূর্ববর্তীদের মতবাদকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মানিয়া লইতেছি; অর্থাৎ আমাদের স্থূল প্রয়োজনগুলির সঙ্গে আর্টকে আমরা যতই বেশী করিয়া জড়িত করিয়া লইতেছি, ততই আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে আমাদের স্থূল প্রয়োজনগুলিই মানুষের প্রয়োজন, সূক্ষ্ম প্রয়োজনগুলি অপ্রয়োজনের বাহুল্য মাত্র। আমাদের পূর্ববর্তিগণ আর্টের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য তাহাকে যথাসম্ভব স্থূল প্রয়োজনের সম্পর্কবিহীন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; তাহার প্রতিক্রিয়া যদি কোথায়ও দেখা দিয়া থাকে আবার আর্টকে বাস্তবপন্থী করিবার নামে আমাদের সূক্ষ্ম প্রয়োজনগুলিকে একধার হইতে আর্টের ক্ষেত্র হইতে ঝাটাইয়া দিয়া বাছিয়া বাছিয়া শুধুস্থূল প্রয়োজনের আমদানির চেষ্টায়, তবে সে চেষ্টাকেও সাধু বলা যাইতে পারে না।

আর্টকে বাস্তবপন্থী করিয়া তুলিতে হইলে জীবনের সমগ্রতা জুড়িয়া যে সত্য রহিয়াছে তাহাকে লাভ করিতে হইবে; ভুলিয়া যাইতে হইবে যে, আমাদের ভিতরকার যে কাদামাখা পশুটা সেইটাই একমাত্র বাস্তব,—আর পশুর অতিরিক্ত যে মানুষটা সেইটাই একান্ত অলীক, অবাস্তব। জীবনের যে বিস্তীর্ণ অংশে চলিতেছে মনের খেলা—বিজ্ঞানের খেলা—আনন্দের খেলা, তাহাকে আমরা স্বীকার করিব তেমনই সত্য বলিয়া যেমন সত্য বলিয়া স্বীকার করি আমাদের অন্নময় সত্তা এবং প্রাণময় সত্তাকে। সেই স্বীকৃতি এবং উপলব্ধির ভিতর দিয়াই জাগিয়া উঠিবে আর্টের গভীরতম প্রয়োজন আমাদের বাস্তব জীবনে,—আর্টকে বাস্তব করিয়া তুলিবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। জীবনের সমগ্রতাকে উপেক্ষা করিয়া একটা দিককেই বড় করিয়া তুলিয়া আমরা কখনই জীবনের বাস্তব সত্যকে খুঁজিয়া পাই না, পাই একদেশিক সত্যকে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, মহারাণীর 'মালঞ্চের মালাকর' আর্টকে বলিয়াছে 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়'। বিংশ শতাব্দীর কাজের মানুষ আমরা এই কথাটিকে যেন বরদাস্তই করিতে পারি না। কিন্তু 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' হইলেই আর্ট একেবারে অকেজো হইয়া যায় কি করিয়া? কলিকাতা

মহানগরীর মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি-করা বাড়িগুলি দেখিয়া এবং তাহার ভিতরকার ঠাসাঠাসি-করা মানুষজন দেখিয়া প্রথমে মনে হয়, কলিকাতার পার্কগুলি এবং মাঠগুলি যেন অনেকখানিই অপ্রয়োজনের ; নাগরিক জীবনের পক্ষে সেগুলি যেন অনেকখানিই 'উপরি পাওনা'। ভাবটা এই, যেন কলিকাতার নাগরিক জীবনের পক্ষে ঠেলাঠেলি-করা বাড়িগুলি এবং পরস্পরপ্রতিস্পর্ধী বাজার, গুদাম এবং আপিসগুলিই শুধু প্রয়োজনের,—পার্কে, মাঠে, ঘাটে যে আমাদের বিহার ওটা নিছক অপ্রয়োজনের আনন্দে,—তাই হয়ত সময়ে সময়ে ঘোর বাস্তববাদী বা সাম্যবাদীর বিজ্ঞতা লইয়া উহাকে আমরা আখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছি বিলাস-ভূমি বলিয়া। কিন্তু বড়বাজারের ঠেলাঠেলিতে আধমরা হইয়া, শেয়ার মার্কেটের চীৎকারে ঝালাপালা হইয়া, আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনিতে জর্জরিত হইয়া গড়ের মাঠ দিয়া যখন বাড়ি ফেরা যায়, তখন মনে হয়—বাঁচিলাম,—তখন বুঝিতে পারা যায়, এই উদ্যানগুলি, এই মাঠগুলি—ইহারা বসিয়া শুধু কলিকাতার শোভা বর্ধন করেন না,—নাগরিকগণের বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই ছিল ইহাদের একান্ত প্রয়োজন। লালদীঘি এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ উদ্যানভূমিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে যে অভ্রভেদী আপিসগুলি তাহারা সকলেই

প্রয়োজনের, আর অপ্রয়োজনের বাহুল্য শুধু উহার মাঝখানের লালদীঘিটি এবং তৎপার্শ্বস্থিত ঐ উদ্যানভূমিটুকু, একথা আমরা যেন কখনও স্বীকার না করি। বিংশ শতাব্দীর আর্টের ক্ষেত্রে বাস্তবপন্থীর দল আমরা আবার লাগিয়া গিয়াছি ঐ উদ্যানগুলির মাঝে মাঝে কতগুলি গুদাম এবং আপিস ঘর তুলিতে; গড়ের মাঠের ভিতরে বড় বাজারের ঠেলাঠেলি এবং কোলাহলকে টানিয়া আনিতে না পারিলে আর্টকে যেন ঠিক আর 'রিয়ালিষ্টিক্' করিয়া তোলা যাইতেছে না। গোড়ার গলদ এইখানে। কলিকাতার ঘরবাড়িগুলি, আপিস-গুদামগুলি, বাজার কারখানাগুলিও সত্য—উদ্যানগুলিও সত্য; কলিকাতায় বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে তাহাদের সকলেরই রহিয়াছে প্রয়োজন; এই কথাটা বুঝিতে পারিলেইত আপিস ও উদ্যানের বিবাদটা ঘুচিয়া যায়। কিন্তু মুস্কিল এই, জীবনে এই সবটাতেই যে আমাদের প্রয়োজন আছে এই কথাটা 'নির্জল' সত্য হইলেও, পাছে বুর্জোয়া বলিয়া গাল খাইতে হয় এই ভয়ে কথাটা আমরা স্পষ্ট স্বীকার করিতে নারাজ।

আমার প্রধান বক্তব্য এই, আর্টকে যেমন নর্দমার পাঁকের ভিতরে টানিয়া লুটোপুটি করাইয়া তাহার অপমান করিয়া লাভ নাই, তেমনি আবার তাহাকে নিরালম্ব শূন্যে অনাত্মীয়

করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াও লাভ নাই। আমাদের যাহা কিছু স্থূল প্রয়োজন তাহাও যেমন 'আমাদের'ই, তেমনি আবার আমাদের ভিতরে যাহা কিছু সূক্ষ্ম প্রয়োজন তাহাও একান্তই 'আমাদের'; তাই মানুষের পক্ষে আর্ট অন্নজলের মতনই প্রয়োজনের। ওটা যদি সহজেই না হইলেও চলিত, তবে এতদিনে একটু একটু করিয়া ওটা লোপ পাইয়া যাইত। সে যে লোপ পায় নাই, ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে আমাদের জীবনে তাহার প্রয়োজন। আমরা যে বাঁচিয়া থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া কতগুলি বস্তুর উপরে বিশেষ করিয়া শীলমোহর করিয়া রাখিতে চাই, এই জিনিসটাই ভুল; কারণ বাঁচিয়া থাকা জিনিসটাই সকলের নিকটে এক রকমের নহে। আমি কোন আলঙ্কারিক বাঁচা-মরার কথা বলিতেছি না, নিছক বাস্তব বাঁচা-মরার কথাই বলিতেছি। একজন কবির নিকটে তাঁহার কাব্যজীবন বা কবিসত্তা তাঁহার জীবসত্তার উপরে কোনও আরোপিত বাহুল্য সত্তা নয়, তাঁহার কবিসত্তা তাঁহার জীবসত্তার সহিত থাকে একান্তরূপে একীভূত হইয়া। সেই কবিসত্তার খোরাক জোটাইতে না পারিলে তাঁহার জীবসত্তাও হইবে ক্ষতিগ্রস্ত। সমস্ত শিল্পী সম্বন্ধেই এই একই কথা। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত-রসিক তিনি

আহার-বিহার পরিত্যাগ করিয়াও সঙ্গীত লইয়া মাতিয়া থাকেন, সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়া শুধু আহার-বিহার লইয়া মাতিয়া থাকিতে পারেন না ; সঙ্গীতের চাহিদা তাঁহার পক্ষে একটা জৈবিক চাহিদা। সকল মানুষের ভিতরেই ক্ষুৎ-পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে অল্পবিস্তর এই আর্টের ক্ষুৎপিপাসা,—উহা তাহার মনুষ্যরূপে অস্তিত্বের একান্ত অঙ্গীভূত। এইখানেই আর্ট আমাদের ভাব-বিলাস মাত্র নহে,—সে আমাদের পরমাত্মীয়,—আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

সাহিত্যের স্বরূপ

বিশ্বসৃষ্টি আমাদের নিকটে যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে সেইরূপ প্রতিভাসনের কারণ কি ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটা মায়াশক্তি। আর সেই মায়াশক্তির স্বরূপ হইল অনির্বাচ্য‍্যা; সে সৎও নয়, আবার সে অসৎও নয়,—এই সত্যমিথ্যা—অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের মাঝখানে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনির্বচনীয় রহস্য, সেই অনির্বচনীয় রহস্যই দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বসৃষ্টির মূলে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিশ্বসৃষ্টির যে রূপটি আমাদের নিকটে প্রতিভাত হইতেছে,—যাহাকে আমরা আমাদের সকল ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সকল সুখ-দুঃখের অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা বাহিরের কোন বস্তুর রূপ নহে, আমাদের মন ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টির কোনো প্রতিভাসন নাই। তবে কি সে সম্পূর্ণই আমাদের মনের সৃষ্টি? তাহাও নহে,—কারণ তাহা হইলে অন্ধ মানুষের মনের ভিতরেও রূপে রঙে ফুটিয়া উঠিতে পারিত বিশ্ব-সৃষ্টির বিচিত্র ছবিটি। এই রূপটি তাহা হইলে জাগিয়াছে কোথায়? সে আমাদের অন্তরেও নাই, সে আমাদের বাহিরেও নাই,—অথচ অন্তর-বাহিরের যোগে

ভাসিয়া ওঠে সৃষ্টির বহু বিচিত্র রূপটি ঐ মায়ার অনির্বচনীয় লীলা-রূপে।

আমাদের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মূলেও পরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এইরূপ একটা মায়াশক্তি,—অনির্বচনীয় তাহার স্বরূপ। আমাদের যে সাহিত্যের জগৎ তাহাকে সত্যও বলিতে পারিতেছি না, মিথ্যাও বলিতে পারিতেছি না,—সত্য-মিথ্যার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে আমাদিগকে দিতেছে বিচিত্র রসানুভূতি। সাহিত্যের ভাষায় কবির সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনকার এই মায়াশক্তিকে আমরা বলি 'প্রতিভা'। সাহিত্যের রসমূর্তিতে আমাদের অন্তরের কাছে যে প্রতিভাসন তাহা কোনো বহির্বস্তুর বা বহির্বিষয়েরই সম্পদ নহে ;—কারণ, যদি তাহা হইত তবে মনোনিরপেক্ষ-ভাবে সে মনুষ্য-সাধারণের নিকটে সমান ভাবে প্রতিভাত হইতে পারিত। সে শুধু মনের বা হৃদয়ের সম্পদও নহে,—কারণ বহির্বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন না করিয়া একান্তভাবে বস্তু বা বিষয়-নিরপেক্ষরূপে সে কখনও আমাদের কাছে আত্ম প্রকাশ করে না। একদিকে রহিয়াছে বহির্জগৎ, অন্যদিকে রহিয়াছে পাঠকের মন,--আর মাঝখানে রহিয়াছে অনির্বচনীয়-স্বরূপ প্রতিভার মায়াশক্তি,—সেই কৌতুকময়ীর বিচিত্র লীলাতেই অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ উভয়ের যোগে—অথচ

উভয়-বিলক্ষণরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে একটা রহস্যময় সাহিত্য-জগৎ।

এই সাহিত্যের জগৎ বিধাতার সৃষ্ট জগৎ হইতে স্বতন্ত্র,—ইহা একান্তভাবে মানুষের সৃষ্ট জগৎ,—এখানে 'কবিরেব প্রজাপতিঃ'। একদিকে রহিয়াছে বিধাতার বিশ্বসৃষ্টি, আর একদিকে রহিয়াছে সহৃদয় পাঠকের মন,—প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় কবি বা সাহিত্যিক মাঝখানে গড়িয়াছেন এই সাহিত্য-জগৎ। কিন্তু কেন? বিধাতা-পুরুষের সহিত এই পাল্লা কেন? তাহার কারণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেন মানুষের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন,—তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়া ঈর্ষা-বশতঃই যেন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন, যেন মানুষ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গভীর রহস্যকে, পরম সত্যকে জানিতে না পারে। কিন্তু মানুষই বা একেবারে হার মানিবে কেন? মানুষের ভিতরে যাঁহারা চতুর তাঁহাদের চোখে ধরা পড়িল বিধাতার এই ঈর্ষাপ্রসূত কারসাজি,—তাঁহারা মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দৃষ্টিকে, শ্রবণকে শুধু বাহিরের স্রোতেই ভাসিয়া যাইতে দিলেন না, তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে চাহিলেন অন্তরের দিকে। তখন লাভ হইল নূতন

দৃষ্টি, নূতন শ্রবণ, নূতন গন্ধ, স্পর্শ, আস্বাদন। মানুষ বুঝিল, বিশ্ব-সৃষ্টিকে সে যেমন করিয়া দেখিয়াছিল, স্বাদে গন্ধে শব্দে স্পর্শে তাহাকে যেমন করিয়া পাইয়াছিল, সেই দেখা ও পাওয়াই ত যথার্থ দেখা এবং পাওয়া নয়,—বিশ্বসৃষ্টি যে আরও অনেকখানি! তখন মানুষ নূতন করিয়া বিশ্বের পানে তাকাইল, —সে তাকানো শুধু বাহিরের দিকে তাকানো নহে,—সেই বাহিরে তাকাইবার পিছনে রহিল একটা ফিরিয়া তাকানো; সেই ফিরিয়া তাকানোর ভিতরে মানুষ দেখিতে পাইল, দৈনন্দিন জীবনের একান্ত তুচ্ছ ক্ষুদ্র সাধারণ জিনিষগুলিও কত বড় হইয়া মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিতরে রহিয়াছে অসীম রহস্য—অনন্ত বিস্ময়! নিখিল বিশ্ব তখন গন্ধে গানে সৌন্দর্যে মাধুর্যে একান্ত অপরূপ হইয়া উঠিল।

বিধাতা-পুরুষের ছলচাতুরী এড়াইয়া মানুষ তখন শুধু মাতিয়া উঠিল বিশ্বের স্বরূপ-সন্ধানে। মানুষ অন্তরে অন্তরে জগৎ সম্বন্ধে লাভ করিল গভীর সত্য;—কিন্তু হায়! পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে সেই ঈর্ষাপরায়ণ বিধাতার অভিশাপ,—সমগ্র অন্তর দিয়া মানুষ যাহা লাভ করিল, অনির্বচনীয় তাহার স্বরূপ,—যে ভাষা বিধাতা-পুরুষ মানুষকে দিয়াছেন সে ভাষাদ্বারা তাহাকে আর প্রকাশ করা গেল না। কিন্তু অন্তরকে তাহা হইলে ত আর বাহিরে প্রকাশ করা গেল

না,—যাহা নিছক আমার, তাহাকে যে সকলের করিয়া তোলা গেল না! বিশ্বমানবের অন্তর হইতে 'আমি' যে তাহা হইলে রহিল চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া।

কিন্তু এই বিচ্ছেদ মানুষ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। কারণ বিশ্বমানবের যোগে যে সে নিরন্তর নিজের ভিতরে নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে গভীর হইতে গভীরতর রূপে। সেখানে যদি আসে বিচ্ছেদ তবে 'আমি' যে পড়ে আপনার গৃহকোণে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া। মানুষের পশ্চাতে ঘোরাফেরা করিতেছে একটা বিদ্রোহী আদিম শয়তান,—মানুষও করিল বিদ্রোহ। বিশ্বের অনির্বচনীয় স্বরূপকে সে ভাষা দিবে, ইহাই তাহার পণ। মানুষ তখন সৃষ্টি করিল অসংখ্য কলা-কৌশল,—সৃষ্টি করিল নূতন ভাষা—নূতন প্রকাশ-ভঙ্গি,—তাহা দ্বারা সে আরম্ভ করিয়াছে কোন্ সুদূর অতীত হইতে যুগে যুগে দেশে দেশে জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয় স্বরূপকে প্রকাশ করিবার সাধনা। এই সাধনা দ্বারাই মানুষ জগৎকে এবং জীবনকে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। বিশ্বের সেই নূতন সৃষ্টিই সাহিত্য-সৃষ্টি এবং অন্যান্য কলা-সৃষ্টি। যুগে যুগে দেশে দেশে চলিয়াছে এই এক সাধনা,—জীবনকে ও জগৎকে শুধু সুন্দর এবং মধুর করিয়া দেখিব না,

তাহার সমস্ত কুশ্রীতা, কারুণ্য এবং রুদ্রত্ব লইয়াই তাহাকে আরও অনেক গভীর করিয়া অনুভব করিব।

গ্রীক্ মনীষী প্লেটো এই সাহিত্য-জগৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সাহিত্য বিশ্বসৃষ্টির একটা 'অনুকরণ' মাত্র। আমাদের এই জগৎটাই জগতের 'আসল' রূপের সন্ধান দিতে পারিতেছে না, সুতরাং এই সাহিত্য-রূপ 'নকল' জগৎটি যে আমাদিগকে সত্যলাভ সম্বন্ধে একেবারে পথে বসাইবে ইহাতে আর সংশয় করিয়া লাভ নাই। সাহিত্যকে জগতের নকল মানিয়া লইলে, প্লেটোর পরবর্তী যুক্তিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য সাহিত্যের তরফ হইতে একদলে হয়ত প্লেটোর কথার জবাবে কাটাছাঁটা ভাবে বলিয়া দিবেন, সাহিত্যের ভিতর দিয়া সত্যকে না পাইলাম ত নাই পাইলাম; সে নকল হোক, মিথ্যা হোক, তাহাকে আমরা চাই,—কারণ সেই নকল এবং মিথ্যাই আমাদের ভালো লাগে,—আর জীবনের পথে ভালো লাগাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কথা।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সুবিশুদ্ধ চার্বাকপন্থী আমরা নই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের মতে সাহিত্যের স্বরূপটিই চার্বাক-মতের বিরোধী। প্লেটো কাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে এই 'অনুকরণ' কথাটি যে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া পণ্ডিতমহলে অনেক

কলহ রহিয়াছে ; সাহিত্য বিশ্ব-প্রকৃতির 'নকল' সাধারণ অর্থে একথা কিছুতেই মানিব না, আর না মানার কারণ রহিয়াছে সাহিত্যের যে সৃষ্টি-রহস্য পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি তাহারই ভিতরে। সাহিত্য বহিঃপ্রকৃতির নকল নয় এই জন্য যে, বহিঃপ্রকৃতির যে অংশ আমাদের নিকট অতি সুস্পষ্টরূপে জানা সে-অংশকে লইয়াই আমাদের সাহিত্য-জগৎ গড়িয়া ওঠে না,—জানার ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া ওঠে যে অজানা, সাহিত্য গড়িয়া ওঠে তাহাকে লইয়া। জানা জগৎটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই উপলক্ষ্য,—লক্ষ্য সেই অজানা। কিন্তু যে অজানা তাহাকে লইয়া সাহিত্য গড়িয়া ওঠে কিরূপে ? এ কথার জবাব এই যে, যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের কাছে—মনের কাছে থাকে অজানা, বুদ্ধির প্রখর আলোককেও যাহা চলিতে চাহে আড়াল করিয়া, তাহা আমাদের হৃদয়ের কাছে আসিয়া ধরা দেয় একটা রস-স্পন্দনের রূপে,—ইহাকেই আমি বলিয়াছি বিশ্ব প্রকৃতির অনির্বচনীয় স্বরূপ, যাহাকে আমরা নিরন্তর প্রকাশ করিতে চাহিতেছি আমাদের সাহিত্যে। প্লেটো হয়ত তৎপূর্ববর্তী যে সকল সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্যকে জীবনের 'অনুকরণ' বলিয়াছেন তাহা গ্রীক্ সাহিত্যের এপিক্ এবং নাটকগুলি : কিন্তু এপিক্, নাটক প্রভৃতি

বিষয়-প্রধান (objective) কাব্যগুলির ভিতরেও যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে একটা বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের যথাযথ বর্ণনা তাহা মনে হয় না; যেখানে সেই বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের ভিতর দিয়া সকল জুড়িয়া মানুষের জীবন-রহস্য আরও গভীর হইয়া একটা অকথিত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া ওঠে নাই, সেখানে তাহা বড় সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

যে বিশ্বসৃষ্টিকে জড় ও চেতনের লীলার ভিতর দিয়া পাইতেছি প্রত্যক্ষে নিরন্তর আমাদের চারিপাশে, তাহাকে আবার সাহিত্যের ভিতরে রূপায়িত করিয়া পাইতে ভাল লাগে কেন? তাহার কারণ, জীবনের ভালমন্দ, সৌন্দর্য-বীভৎসতা, কারুণ্য-রুদ্রত্ব সকল জড়াইয়া আমাদের চোখে জাগিয়া ওঠে যে বিস্ময়, ব্যঞ্জিত হইয়া ওঠে যে মহিমা, তাহাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে এবং পাইতে চাই সাহিত্যে। রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় বিষয়-প্রধান সাহিত্য জগতে আর কি আছে? কিন্তু সে কি তৎকালীন জীবনের ফোটোগ্রাফ মাত্র? সমস্ত জুড়িয়া কবি-গুরু বাল্মীকি এবং ব্যাসদেব কি কথা বলিয়াছেন? বলিয়াছেন,—"জীবনকে দেখ,—বিশ্ব জগৎকে দেখ,—কত তার রহস্য—প্রতি রন্ধ্রে ভরা রহিয়াছে অসীম বিস্ময়,—অনির্বচনীয় তাহার মহিমা'!

জীবনের সেই অনির্বচনীয় মহিমাকে আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছি গভীর রস-স্পন্দনে, জীবনের সেই অনির্বচনীয়তাকেই লক্ষ লক্ষ শ্লোকে বচনীয় করিয়া তুলিয়াছি আমাদের কাব্যে। জীবন-বেদের পাতায় পাতায় লেখা রহিয়াছে যে গভীর সত্য তাহা হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানুষকে করিতে চাহিয়াছিলেন বঞ্চিত; জীবনের সেই গভীর সত্যকে আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছতার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে দিই নাই; আমরা ফিরিয়া তাকাইয়াছি জীবনের পানে, আমরা জীবনের অমৃত লাভ করিবার জন্য 'আবৃত্তচক্ষুঃ'। জীবনের পানে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিয়াছি যে বিপুল রহস্য—প্রতিপদে লাভ করিয়াছি যে বিস্ময় তাহাকে প্রকাশ করাই আমাদের লক্ষ্য, রাম-রাবণের যুদ্ধ বা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ উপলক্ষ্যমাত্র।" এইজন্য আমরা বিষয়-সর্বস্ব অথবা বাস্তবপন্থী সাহিত্য বলিয়া যেখানে কোলাহল করি, সেখানেও বাড়াবাড়ি করিবার কিছুই নাই, যাহা শুধু দেখিয়া শুনিয়াই তৃপ্তি—দেখা-শুনার পশ্চাতে যে রাখিয়া যায় না ভাবনার মূর্ছনা তাহাকে লইয়া কখনও কোনোদিন সাহিত্য হয় নাই; আর এই ভাবনার মূর্ছনার পশ্চাতে রহিয়াছে আমাদের অন্তরেব গভীর বিস্ময়।

আমরা আধুনিক কালে এক রকমের তথাকথিত

বিষয়-সর্বস্ব কবিতা রচনা করিতেছি। সেখানে আমরা চেষ্টা করি প্রবহমান সংসারের কোথাও হইতে এক টুকরা ছবিকে ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহাকে তাহার বিশুদ্ধতম আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে। তাহার গায়ে যাহাতে আমাদের মনের রঙের দাগ লাগিয়া সে বিকৃত হইয়া না ওঠে, সেই দিকেই থাকে আমাদের সচেতন চেষ্টা। আমরা বলি, তাহার আত্মগত সমাবেশের ভিতরেই আছে একটা মহিমা, আমরা লাভ করিতে চাই সেই মহিমাকে। কিন্তু আজকালকার এই জাতীয় কবিতাকে একটু নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, যাহাকে আমরা বলি বিশ্ব-সংসারের খণ্ডচ্ছিন্ন একটি দৃশ্য বা ঘটনার আত্মগত সমাবেশের মহিমা, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি বিশ্ব-প্রবাহের বিপুল পটভূমি; সেই বিপুল পটভূমি থাকিয়া যায় আমাদের সচেতন মনের পটভূমিতে,—সেই অসীম অনন্ত পটভূমিই দান করে খণ্ডচ্ছিন্ন একটি অংশকে অকথিত মহিমা। আমরা আমাদের এই জাতীয় কবিতার ভিতরে বর্ণনীয় বিষয়কে যতই বৃহত্তর জগতের বিপুল প্রবাহ হইতে টানিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া আঁকিতে চাই না কেন, এখানে সেখানে থাকিয়া যায় সেই বৃহত্তর প্রবাহের আভাস ইঙ্গিত,—সেই বৃহতের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়াই ক্ষুদ্রও হইয়া ওঠে বৃহৎ। নিছক আত্মগত

সমাবেশের (composition) মহিমা চিত্রশিল্পের বেলায় যদি বা সম্ভব হইয়া উঠে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সংশয় আছে। যুক্তির দ্বারা তাহার সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব।

বিশ্বনাথ কবিতার রসের স্বরূপ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, রস হইল 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণঃ'। কবি কর্ণপূরও বলিয়াছেন,—'চমৎকারি সুখং রসঃ।' বিশ্বনাথের মতে চমৎকার অর্থ চিত্তবিস্তার-রূপ বিস্ময়। তাহা হইলে রসের ভিতরে যে একটা আনন্দবোধ রহিয়াছে সেই বোধের সহিত অভিন্ন হইয়া রহিয়াছে একটা পরম বিস্ময়বোধ। এই প্রসঙ্গে ধর্মদত্তের গ্রন্থ হইতে যে মতটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও দেখিতে পাইতেছি যে, 'চমৎকার' বা বিস্ময়ই হইতেছে রসের সারবস্তু—এবং এই জন্যই কাব্যে যত প্রকারের রস হয় তাহার মূলে রহিয়াছে একটা অদ্ভুত রস।* কথাটার তাৎপর্য কি? পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জীবনের ভিতরে রহিয়াছে যে অতলস্পর্শ রহস্য তাহা আমাদের কবি-মনকে নিরন্তর করিতেছে বিস্ময়-মুগ্ধ; আমাদের সাহিত্যের রসানুভূতির

* রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্॥

ভিতরে একটা গভীর আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়া আমরা লাভ করি বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে একটা লোকোত্তর চমৎকৃতি,—একটা পরম বিস্ময়। জীবনের যত প্রেম, যত হাসি, যত করুণা, যত উৎসাহ, রুদ্রত্ব, ঘৃণা, ভয় কিছুই সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে না যতক্ষণ না সে একটা বিস্ময়ের ভিতর দিয়া আভাস না দেয় জীবনের গভীর রহস্যের। এই বিস্ময়-লক্ষণের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের লৌকিক আনন্দভোগ এবং আমাদের অলৌকিক ধর্মানন্দের সহিত সাহিত্যের রসাস্বাদের একটা প্রকারভেদ স্থাপন করিতে পারি। প্রেমের আনন্দে যত বিস্ময় কম, চিত্তের প্রসার কম,—ততই সে লৌকিক, সাহিত্যের জগৎ হইতে সে থাকে দূরে। আমাদের ধর্মরাজ্যের প্রেমেও আনন্দের গভীরতার সহিত রহিয়াছে সকল রহস্য—সকল জিজ্ঞাসা—সকল বিস্ময়ের পরিনির্বাণ; যে আনন্দানুভূতি আনে শুধু চিত্তের পরিনির্বাণ সে যতই বৃহৎ হোক না কেন, তাহাকে সাহিত্যের জগতে স্থান দিতে পারি না। সাহিত্যের রস তাই 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যঃ' হইয়াও 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণঃ'। সাহিত্যে ধর্মের স্থান রহিয়াছে, ভগবৎ-প্রেম লইয়া অনেক কাব্য-কবিতা হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যের যে ভগবৎ-প্রেম মানুষকে একান্ত পরিনির্বাণের পথে লইয়া যাওয়াই তাহার

মুখ্য কাজ নহে, সে মানুষের মনকে লইয়া যায় রহস্যের গভীরতায়—বিস্ময়ের অতলতায়। সেই রহস্য এবং বিস্ময় লইয়াই ধর্মও সাহিত্য হইয়া ওঠে।

সাহিত্য-সৃষ্টির আদিম প্রেরণার ভিতরেই রহিয়াছে এই চিত্তপ্রসার-রূপ চমৎকৃতি বা বিস্ময়। বিশ্বসৃষ্টিকে মানুষ যত দেখিয়াছে, তাহার রহস্যময় বৈচিত্র্যে তত সে হইয়াছে বিস্ময়-বিমুগ্ধ; এই জগৎ হইতে জীবন হইতে সে অনেক পাইয়াছে প্রেম, অনেক পাইয়াছে সৌন্দর্য, মাধুর্য,—অনেক পাইয়াছে হাসি-কান্না, আশা-উৎসাহ, ঘৃণা-ভয়; জগৎ এবং জীবন হইতে দুই হাত ভরিয়া এই যে নিরন্তর পাওয়া তাহাকে যতক্ষণ সে ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে ক্ষণিক হৃদয়-বৃত্তির বিস্ময়-হীন আলোড়নে ততই তাহাকে করিয়াছে ক্ষুন্ন সাধারণ লৌকিক জীবনের অমহিমায়; জীবনের চলার পথে ধূলা-মাটির ভিতরে সে হারায় আপন সত্তা। কিন্তু জীবনের সকল পাওয়াকে মানুষ এমনি করিয়া ধূলায় বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই; মানুষের মহত্তর সত্তায় এই সকল পাওয়া তুলিয়াছে স্পন্দন,—মানুষ পাইয়াছে আর বিস্মিত হইয়াছে, তাই সে পাইয়াছে আর ভাবিয়াছে,—সেই পাওয়া আর ভাবনায় মিলিয়া মিশিয়া গড়িয়াছে একটা মনোময় লোক,—সাহিত্যের সৃষ্টি সেইখানে।

জীবনের যে সকল অনুভূতি একটা ভাবনার অনুরণন না রাখে তাহারা সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে না। জগৎ-ব্যাপার এবং জীবন-প্রবাহের পশ্চাতে এই যে একটা অনুরণন রহিয়াছে, তাহা লইয়াই গড়িয়া ওঠে আমাদের কাব্যলোক। প্রেমের যে দুইটি রূপ—সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ তাহার প্রথমটি লইয়া কাব্য জমিয়া ওঠে না ; কারণ, সম্ভোগের ভিতরে নায়ক-নায়িকা উভয়ে উভয়ের এত কাছাকাছি যে মাঝখানে বিস্ময়ের স্থান নাই, তাই সেখানে নাই ভাবনার অনুরণন। বিরহ সৃষ্টি করে যতখানি ব্যবধানের ততখানি বিস্ময়ের, কারণ প্রেমের দুই পারের মাঝখানে ত থাকিতে পারে না কোন ফাঁক, ব্যবধানের দূরত্ব তাই ভরিয়া যায় রহস্যের গোধূলিতে,—সে বিস্মিত করে—ভাবায়,—সে আনে চমৎকৃতি, তাই বিরহ লইয়া হয় কাব্য।

বৃহৎ জগৎ-ব্যাপারের ভিতরকার অনুরণনকে অনুভব করিতে হইলে নিজেকে এই জগৎ-ব্যাপারের ঘূর্ণি এবং কোলাহল হইতে একটু গুটাইয়া লইতে হয়,—একটু ঊর্ধ্বে রাখিতে হয়। বেদে দেখিতে পাই, 'নৃচক্ষাঃ' অর্থাৎ মনুষ্যদিগের দ্রষ্টাকে 'কবি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে,—'কবির্নৃচক্ষা অভিষীমচষ্ট' (ঋগ্বেদ, ৩।৫৪।৬) ; সূর্যদেব যেমন আকাশে অবস্থান করিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে দর্শন করেন, কবিকেও

তেমনই এই সংসারের ঘূর্ণিপাক হইতে আত্মস্বরূপে একটু ঊর্ধ্বে অবস্থান করিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিতে হয়। রাজপথের কোলাহলের সহিত যে লোক কোলাহল করিয়া চলে এবং সেই কোলাহলের ভিতরেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দেয়, সে কোলাহলকে ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পায় না,—তাই সেই কোলাহলের পশ্চাতে রহিয়াছে যে বিস্ময়-বিমথিত ভাবনার অনুরণন তাহা তাহার নিকট থাকিয়া যায় একেবারে অজ্ঞাত। এমন লোক আছে যে ঐ রাজপথের মিছিলের সঙ্গেই চলিয়াছে কোলাহল করিয়া,—কিন্তু মাঝে মাঝে সে থামিয়া যায়,—চোখ মেলিয়া দেখিতে চাহে রাজপথের শোভাযাত্রাকে, শুধু পরের চলাকে নহে, নিজের চলাকেও, কাণ পাতিয়া শুনিয়া লয় শুধু পরের কোলাহলকে নহে, নিজের কোলাহলকেও; তখনই সে অনুভব করিতে পারে চলার পশ্চাতে যে অনুরণন রহিয়াছে, কোলাহলের পশ্চাতে যে অনুরণন রহিয়াছে তাহাকে। শব্দের অনুরণন শব্দের মতন স্থূল নহে, তাই তাহাকে শুনিতে হয়, বিশেষ ভাবে কাণ পাতিয়া; জগৎ-ব্যাপারের পশ্চাতে রহিয়াছে যে বিস্ময়ের অনুরণন তাহাও তেমনি জগৎ-ব্যাপারের ন্যায় স্থূল নহে, তাহাকে লাভ করিতেও চাই সেই তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এই জন্যেই কবিকে হইতে হয় 'আবৃত্তচক্ষুঃ'।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ভিতরে একদল ধ্বনিবাদী আছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমরা যাহা বলি সেই বলা যখন বলার ভিতরেই শেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ বলাটার যে একটা সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট অর্থ রহিয়াছে সেই অর্থটির প্রকাশের সঙ্গে যখন তাহার সমস্ত কর্তব্যটুকু শেষ হইয়া যায় তখন সে কাব্যেতর; কিন্তু সেই বলার সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অর্থটিই যেখানে প্রধান নয়, বলার ভিতর দিয়া আভাসে ইঙ্গিতে প্রধান হইয়া উঠে একটা বাক্যাতীত অর্থ, সেইখানেই সে কাব্যপদবাচ্য। এই যে বাচ্যার্থের ভিতর দিয়াই বাচ্যার্থকে ছাপাইয়া ওঠে একটা বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনা ইহাই ধ্বনি, সেই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা।

এই ধ্বনি শব্দটিকে আর একটু গভীর এবং ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলেই আমরা কাব্যের আত্মাকে লাভ না করিলেও তাহার অন্তর্দেশে প্রবেশাধিকার লাভ করিব। উত্তম সাহিত্য যে ধ্বনি-প্রধান তাহার কারণ এই যে, মূলতঃ ধ্বনি লইয়াই গড়িয়া ওঠে সকল সাহিত্য, সে ধ্বনি হইতেছে সমগ্র সৃষ্টির ধ্বনি। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে—সে বৃহৎ হোক বা ক্ষুদ্র হোক, সুন্দর হোক বা কুশ্রী হোক, সুখের হোক বা দুঃখের হোক—তাহারা কিছুই আপনাতে আপনি লীন হইয়া যাইতেছে না, সকল ঘটনের

ভিতর দিয়া থাকিয়া যাইতেছে একটা অঘটনের ঝঙ্কার, ইহাকেই আমি বলিয়াছি জগৎ-ব্যাপারের অনুরণন। বিশ্ব-প্রবাহের ভিতরে নিহিত রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্যই বিধাতার ছলা-কলা, মানুষ তাই এমন একটি জীবন গড়িয়া লয় তাহার সাহিত্যের ভিতরে যেখানে সে সকল দৃশ্য, গন্ধ, গান,—সকল ঘটনা-প্রবাহের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চায় সেই ধ্বনিকে। প্রকৃতিতে এবং সাহিত্যে এইখানেই তফাৎ। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরে রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকে সাধারণ লোকে ধরিতে পারে না, তাহা ধরা পড়ে শুধু বিশেষ বিশেষ দেশে ও কালে বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে। সেই বিশেষ লোকই জগতের বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিক, বিশ্ব-জীবনের ধ্বনিকে তাহারা সুলভ করিয়া তোলেন তাঁহাদের নিজেদের সৃষ্টির ভিতর দিয়া। সাহিত্যের ভিতরে আমরা বহির্বিশ্বকে যেমনটি ঠিক তেমনটি করিয়া কখনই প্রকাশ করি না,—উগ্রতম বাস্তববাদী সাহিত্যেও না; কারণ, বিশ্ব-জীবনকে যেমনটি ঠিক তেমনটিই প্রকাশ করিলে তাহার ধ্বনিটিকে যে প্রকাশ করা হইত না। তাই সর্বপ্রকার সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরেই রহিয়াছে অনেক ছাটাই-বাছাই, নানাপ্রকার কলাকৌশল; এই সকল প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে এই মুখ্য উদ্দেশ্য,

বিশ্ব জীবনের সেই অংশটুকু সেইভাবে প্রকাশ করা যাহাতে বিশ্বজীবনের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকেই সব চেয়ে স্পষ্ট এবং সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা হয়।

বহির্জগতের নায়ক-নায়িকা শুধু প্রেম করে না, আরও হাজার রকমের কাজ করে; কিন্তু জগতের যত কাব্য-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক হইয়াছে তাহা যে অধিকাংশই নায়ক-নায়িকার প্রেম লইয়া, তাহার কারণ এই যে প্রেমের ভিতরে মানুষ সবচেয়ে বেশী পাইয়াছে জীবনের রহস্য—বিস্ময়,—জীবনের ধ্বনির সন্ধান। সেই ধ্বনিটুকু ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বাস্তব জীবনের যেটুকু যেটুকু প্রয়োজন, কাব্যের ভিতরেও আমরা গ্রহণ করি সেইটুকুই। তাহা যে শুধু রোম্যান্টিক্ কাব্যে বা আদর্শবাদী কাব্যে করি তাহা নহে, তাহা করি সকল বাস্তববাদী সাহিত্যেও। আমাদের বর্ত্তমান যুগের দৃষ্টিতে আমরা হয়ত জীবনের রহস্য পাইয়াছি শুধু নায়ক-নায়িকার প্রেমের ভিতরে নহে, তাহাকে পাইয়াছি পরস্পরের ঘৃণা-বিদ্বেষের ভিতরেও; কিন্তু সেই ঘৃণা-বিদ্বেষের ঘাত-প্রতিঘাতের যে রূপ আঁকিয়া তুলি আমরা আমাদের সাহিত্যে সে আমাদিগকে কি দিতেছে? ঘৃণা-বিদ্বেষের ভিতর দিয়াও মানুষের জীবনে জাগিতেছে যে গভীর রহস্য, যে জীবন-ধ্বনি, তাহাকেই সে প্রকাশ করিতে চাহে তাহার

সকল রূঢ়তার ভিতর দিয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাই আমরা শুধু সুন্দরকে—শুধু মধুরকে খুঁজি না,—জীবনের সকল দুঃখ-বেদনা, সকল ঘৃণা-বিদ্বেষ, রুদ্রত্ব-বীভৎসতাও সাহিত্যের রস হইয়া উঠিতে পারে যদি সে প্রকাশ করে জীবনের ধ্বনিকে। জীবনের সেই ধ্বনির স্বরূপ পরম বিস্ময়।

জগৎ-ব্যাপারের পশ্চাতে এই যে একটি অনুরণন তাহা দ্বারাই সৃষ্ট হয় কবির অন্তর রাজ্যে একটি বিশেষ বাসনা-লোক। জীবনের ধন তাই কিছুই ফেলা যায় না। যাহা কিছু বাহিরে পাওয়া যায় স্থূলে বাহিরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তাহাই আবার একটি অনুরণনের রূপে অন্তরে প্রবেশ করিয়া গড়িয়া তোলে এই সাহিত্যের বাসনা-লোক। এই বাসনা-লোক হইতেই যেমন সাহিত্যের সৃষ্টি, এই বাসনা-লোকেই আবার সাহিত্যের আস্বাদন। সম-বাসনার যোগেই একটি হৃদয় অপরের কাছে হইয়া ওঠে 'সহৃদয়;' আর, দুইটি সহৃদয়ের যে হৃদয়-সংবাদ তাহাই সাহিত্যের যথার্থ 'সাহিত্য'। এই বাসনা-লোকের সামগ্রী বলিয়াই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু শরীরী হইয়াও অশরীরী। শরীরী সে বাহিরের যোগে, অশরীরী সে অন্তরের যোগে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু যেমন একদিকে স্থূল বাস্তব নহে, অন্যদিকে সে একান্তভাবে বস্তু-

বিয়োজিতও নহে। বিশ্বসৃষ্টি যে আমাদের চিত্তরাজ্যে স্থান লাভ করে বাসনারূপে তাহার ভিতরে বিধৃত হইয়া থাকে বিশ্বসৃষ্টির শরীরী রূপ তাহার দেহাতীত অনুরণনের রূপের সহিত যুক্ত হইয়া। এই দেহ এবং বিদেহের মাঝখানে জাগিয়াছে সাহিত্য, দেহের ভিতর দিয়া দেহাতীতেরই সন্ধান দিতে। কবির বাসনা-লোকে বিধৃত বিশ্ব-জীবনের অনুরণন লোকোত্তর চমৎকৃতির ভিতর দিয়া নিরন্তর জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, প্রেম-ঘৃণা, বীরত্ব-ভয়কে অপূর্ব আস্বাদ্য করিয়া তুলিতেছে, বিশ্ব-জীবনের সেই আস্বাদ্যমানতার নামই 'রস'।

সাহিত্যের এই রস আমাদের চিত্তের বন্ধন মোচন করে। বহির্বিশ্ব প্রতি মুহূর্তেই দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা আমাদের চিত্তের উপরে টানিয়া দিতেছে অসংখ্য আবরণ, এই আবরণ আমাদের চিত্তকে টানিতেছে বন্ধনের দিকে। সুখের বন্ধন সোনার শৃঙ্খলের বন্ধন, দুঃখের বন্ধন লোহার শৃঙ্খলের বন্ধন, উভয়ই দিতেছে অতৃপ্তির বেদনা। উদ্ভট মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা! সে জগৎকেও চায়, জীবনকেও চায়, আবার সেই সঙ্গে সব লইয়া চায় পলে পলে বন্ধন হইতে মুক্তি, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের ভিতরে, সীমা হইতে অসীমের ভিতরে মুক্তি। সাহিত্য সেই মুক্তির জগৎ। হাজার রকম বন্ধনের আয়োজন

করিয়া তাহারই ভিতরে সে আমাদের মনকে যে বিশ্ব-জীবনের আকাশে একটুখানি ঘুরিবার সুযোগ দেয়, সেই-খানেই আমাদের তৃপ্তি, তাই আমরা জীবন ছাড়িয়া আবার সাহিত্য চাই।

সাহিত্যে রসানুভবের কোন বিশেষক্ষণে আসিয়াই যে আমাদের চিত্তের বন্ধন মোচন হয় তাহা নহে, এই বন্ধন-মোচনের আয়োজন রহিয়াছে প্রথমাবধিই। সাহিত্যের ভিতরে সাধারণীকৃতি বলিয়া একটা ব্যাপার আছে, তাহার ভিতরেই রহিয়াছে আমাদের সীমা হইতে অসীমে যাত্রা। এ অসীমে যাত্রার বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য এইখানে যে, এখানে সীমা আছে কিন্তু তাহার বন্ধন নাই ; সীমাকে অস্বীকার করিয়া অসীমে চলিয়া যাই না, সীমাই এখানে দেখা দেয় অসীমের রূপে। আপিসের কেরাণী আলো-হাওয়া-শূন্য আপিস ঘরের ভিতরে মোটা মোটা অঙ্কের যোগ-বিয়োগের ফাঁকে ফাঁকে পড়িতেছে গল্প এবং উপন্যাস ; তাহাতে হয়ত লেখা রহিয়াছে কেরাণী জীবনের লাঞ্ছনাময় দুর্বহতারই কথা। কিন্তু বাস্তব জগতের কেরাণী-জীবন তাহার মনকে যতই বিষাইয়া দিক না কেন, সাহিত্যের কেরাণী-জীবন তাহার চিত্তকে অমৃতরসে সিঞ্চিত করিয়া দিতেছে ; তাই বড় সাহেবের নিরন্তর বকুনি এবং ঝাঁকুনি হজম করিয়াও সে যখনই ফাঁক পাইতেছে তখনই

নির্বিকারে পড়িতেছে গল্প এবং উপন্যাস। ইহার কারণ চিত্তের বন্ধন-মোচন। বাহিরের জগতের কেরাণী তাহার দেশ-কালের খণ্ডিত সত্তা লইয়া আমাদের চিত্তকেও শত আবরণে খণ্ডিত করিতেছে। সাহিত্যের ভিতরেও দেশ রহিয়াছে, কাল রহিয়াছে, কেরাণীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি সকল জুড়িয়া রহিয়াছে তাহার একটা দেশ-কাল-পাত্র-নিরবচ্ছিন্ন রূপ। এই যে দেশ-কাল-নিরবচ্ছিন্ন রূপ তাহাই চিরন্তন রূপ,—তাহাই অসীম। প্রমেয়ের ভিতরে এই যে চিরন্তনের অসীমতা তাহাই প্রমাতার ভিতরে আনে আত্ম-প্রসারণ, তাহাই সাহায্য করে প্রমাতৃ-চিত্তের বন্ধন মোচনের।

আমাদের জাগতিক জীবনের যে সাধারণ অনুভূতিগুলি তাহারা জাগিয়া ওঠে 'আমি' এবং 'আমি-না'-কে লইয়া। এই 'আমি' এবং 'আমি-না'-কে গড়ে চিত্তের বন্ধন, মনকে সে চারিদিক হইতে ধরে ঘিরিয়া, বৃহৎ জীবনের রহস্যকে রাখে আচ্ছাদিত করিয়া। মানুষ চায় এই 'আমি-না'-র সঙ্গে 'আমি'র একটা গভীর মিল, কারণ এই মিলের ভিতর দিয়াই 'আমি'ও মুক্তি পায় তাহার প্রাচীর-ঘেরা বিচরণ-ভূমি হইতে। এই মিলটা অতি সহজ হইয়া আসে সাহিত্যের ভিতরে, তাই সাহিত্যে 'আমি'রও আছে মুক্তি।

সাহিত্যের যে রস তাহা কাহার সামগ্রী? তাহা পরের বলিয়া মনে হয়, আবার পরের নয়; আবার আমার বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আবার মনে হইতেছে সে যেন আমারও নয়। 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ'। রামায়ণ কাব্য হইতে যে করুণ-রসের ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহা রাম-সীতারও বটে, বাল্মীকি মুনিরও বটে, আজ যে আমি বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছি, আমারও বটে। রসাস্বাদকালে বিভাবাদিরই যে কোন 'পরিচ্ছেদ' থাকে না তাহা নহে, রসাস্বাদকেরও থাকে না 'পরিচ্ছেদ'। এই সীমাহীনতারই ভিতরে—নিত্যকালের বিশ্বসৃষ্টির সহিত মানবমনের নিগূঢ় যোগ। এই যে আমি হইতে বিশ্বে এবং বিশ্ব হইতে আমাতে আসা-যাওয়ার একটা সহজ পথ দেখিতেছি সাহিত্যের মধ্যে তাহার ভিতরে মমত্বও তাহার মমত্ব হারায় না, পরত্বও তাহার পরত্ব হারায় না, উভয়ে থাকে অবিনা-ভাবে যুক্ত হইয়া। সেখানে বহির্বিশ্বও ওঠে গভীর রহস্যের বিরাট মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, 'আমি'ও ওঠে তাহারই যোগে সর্বব্যাপী হইয়া, আর 'আমি'র এই সীমাহীন ব্যাপ্তিতেই মানুষের গভীরতম আনন্দ।

সাহিত্যে আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদ

[সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ কি এবং নীতিজ্ঞান বা মঙ্গলের আদর্শের সহিত তাহার সম্পর্ক কোথায় এবং কতটুকু, সাহিত্যের আদিম জন্ম-লগ্ন হইতে আজ পর্যন্ত এ সমস্যাটি সাহিত্যের পিছনে লাগিয়াই আছে; এবং এ আশা আমরা কোন দিনই করিতে পারি না যে, সাহিত্যের অস্তিত্ববোধ হইতে এই উপসর্গটিকে অনাগত কোন কালেও একেবারে মুছিয়া ফেলা যাইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ বা মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামতের মহাভারত সঙ্কলন করিয়া লাভ নাই।] সুতরাং এখানে শুধু আমাদের আদর্শবাদিগণের বিরুদ্ধে সাহিত্যের তরফ হইতে প্রধান অভিযোগটি কি এবং সেই অভিযোগের উত্তরে আদর্শবাদি-গণের পক্ষ হইতেই বা কি জবাব দেওয়া যাইতে পারে, তাহারই একটা বোঝা-পড়া করা দরকার।

বাঙলা-সাহিত্যে [বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা একজন পাকা আদর্শবাদী বলিয়া জানি।] আজকাল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ভিতরে আদর্শবাদের অনধিকার প্রবেশ করাইয়া সাহিত্যের

সৌন্দর্য ও রসের স্বরূপকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তিনি শুধু যে যুক্তিতর্ক দ্বারাই সাহিত্যের স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ঘটাইয়াছেন তাহা নহে; তিনি তাঁহার সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির ভিতরেই এই আদর্শবাদের নীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন,—ফলে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির শিল্প-মাধুর্য পদে পদে তাঁহার নীতিজ্ঞানের অভিভাবকত্বে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরে আর্টের যে অপমান তাহা তাঁহার অক্ষমতার জন্য নহে, তাহা নৈতিক চর্চার বাড়াবাড়িতে অনেকখানি স্বেচ্ছাকৃত।

সাহিত্যের যে আদর্শটিকে মাথায় করিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি দায়ের করিতেছি, সে আদর্শটি হইতেছে Art for Art's sake—বা 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই মতবাদ। শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিশুদ্ধ এবং অবিমিশ্র রসানুভূতির আদর্শটি আমরা বর্তমান যুগে গ্রহণ করিয়াছি পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে। ভারতীয় শিল্পাদর্শে সুন্দর বা মধুরকে কখনও মঙ্গল হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই। জীবনের বৃহত্তর পরিধি এবং আদর্শের ভিতরে এই দুইই রহিয়াছে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়া। আমরা আজকাল আমাদের জীবনকে এবং জীবনের আদর্শকে যেরূপ বহু বিভাগে ভাগ করিতে শিখিয়াছি, প্রাচীনেরা তাহা কোন দিনই করেন নাই; অবিরোধে যাহাতে জীবনের সকল রসের

ধারা গিয়া একের ভিতরে আত্মহারা হইতে পারে, সেই দিকেই ছিল তাঁহাদের সকল চেষ্টা। সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'আর্টের জন্যই আর্ট' মতবাদটির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, পাশ্চাত্ত্য দেশে এই মতটি গড়িয়া উঠিয়াছিল একটা বিশেষ যুগে—আর্টের একটি শাশ্বত এবং সুবিশুদ্ধ তত্ত্ব হিসাবেই নহে, অনেকখানি একটা বিরোধী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-রূপে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপের সাহিত্যিক-মহলে একদল লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন প্রমাণ এবং প্রচার করিতে যে, আর্টের স্বরূপ খানিকটা শর্করামণ্ডিত কুইনাইনের ন্যায়; মাধুর্য তাহার মুখ্যধর্ম, ম্যালেরিয়া নাশের প্রতিও রহিয়াছে তাহার লক্ষ্য। কিছু দিন এই মতটি লইয়া চলিয়াছিল বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি, চারিদিক হইতে চেষ্টা চলিতেছিল আর্টের সৌন্দর্য-মাধুর্যকে নীতি-উপদেশের বাহন স্বরূপে প্রচার করিতে। কিন্তু এতখানি 'মাষ্টারি'র চাপে মানুষের মন একটু একটু করিয়া উঠিল বিদ্রোহী হইয়া,—সে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া বসিল একেবারে উল্টা কথা,—সে বলিল,—আর্টই আর্টের সব, নীতি-উপদেশ অনেক স্থলেই তাহার ঘাড়ে একটা চাপাইয়া দেওয়া বোঝা; কোথাও কোথাও সে রূপ গ্রহণ করে আর্টের উপরে একটা অসহ্য অত্যাচার

রূপে। 'আর্টের জন্যই আর্ট' কথাটা তখন আবার চারিদিক হইতে জাগিয়া উঠিল একটা 'যুদ্ধ-ধ্বনি' রূপে। কিন্তু আর্টের ইতিহাসে যে কথা প্রথমে অনেকখানিই ছিল একটা 'যুদ্ধ-ধ্বনি,' ক্রমে সাহিত্যের আসরে তাহাই দেখা দিয়াছে একটা শাশ্বত সত্যরূপের দাবী লইয়া।

(বর্তমানে আমরা 'আর্টের জন্যই আর্ট' কথাটি বলিতে বুঝি এই যে, আমাদের শিল্পবোধ বা সৌন্দর্যবোধের সত্তাটি অপর সকল বোধ-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র বস্তু; সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। এই স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বোধ বা সৌন্দর্যবোধের একটা স্বরূপ এবং স্বধর্ম আছে; আর্টকে বিচার করিতে হইলে বা তাহার সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন মতামত প্রকাশ করিতে হইলে, তাহার এই স্বধর্মই হওয়া উচিত আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা সাধারণতঃ আর্টের স্বধর্মের এই বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া চলি না;) তাই আর্টের ভালমন্দের বিচার করিতে বসিয়া আমরা আদালতের আইন, স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার ভালমন্দ বিধি-নিষেধেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু একজন নৈষ্ঠিক রূপদক্ষ বলিবেন,—আমার প্রতি কোন দণ্ডাদেশ দিতে হইলে, দেখ আমি আমার স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি কিনা; রূপকারের ধর্ম পালন করিয়া

আমি যদি স্মার্তধর্ম হইতে কিঞ্চিৎ স্খলিতও হইয়া থাকি তবে তাহা ধর্তব্য নহে। এখানে এখন প্রশ্ন উঠিবে এই, রূপকারের ধর্মকে আমরা স্মার্তধর্মের আওতা হইতে একেবারে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রয়োজন হইলে স্মার্তধর্মকে লঙ্ঘন করিতেও দিতে পারি কিনা, এবং যদি পারি তবে তাহা কতখানি।

আলোচনা আরম্ভের পূর্বেই বলিয়া রাখিতেছি, যাঁহারা কাব্য সম্বন্ধে একেবারে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—'যেহেতু কাব্য হইতেই অতি সুখে অল্পবুদ্ধি লোকেরও চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি ঘটে, সেই কারণেই তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে',* আমরা তাঁহাদের দলভুক্ত নই। কিন্তু অপরপক্ষে যাঁহারা 'আর্টের জন্যই আর্ট' বলিয়া অন্য সর্বক্ষেত্রে একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া বিচরণ করিবার অধিকার দাবী করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকার স্বীকার করিতেও আমাদের রহিয়াছে যথেষ্ট আপত্তি।

প্রথমেই প্রশ্ন করা যাইতে পারে,—আর্টের স্বাতন্ত্র্য, আত্ম-পরিপূর্ণত্ব বা অনন্যনিরপেক্ষত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি?

---

* চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥ (বিশ্বনাথ কবিরাজ)

তাহার অর্থ যদি এই হয় যে, স্বরূপে অবস্থিত আর্টের একটা 'কেবল' বা 'অসঙ্গ' রূপ আছে, যাহার সহিত আমাদের অন্য জাতীয় কোন বোধের কোন সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না, তবে মনস্তত্ত্বের দিক হইতে আমাদিগকে বৃহত্তর সমস্যায় পড়িয়া যাইতে হয়। কিন্তু একদল শিল্পতত্ত্বজ্ঞ আছেন, যাঁহারা আমাদের বিশুদ্ধ শিল্পবোধকে ঠিক মনোরাজ্যের বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিবেন না; সে ক্ষেত্রে আমাদের শিল্পবোধ সম্বন্ধে সাধারণ মনস্তত্ত্বের নিয়মকানুন প্রয়োগ করিতেই তাঁহাদের থাকিবে একটা মৌলিক আপত্তি।

সাধারণ শিল্প সম্বন্ধে কথা না বলিয়া আলোচনা-ক্ষেত্রকে সাহিত্যের ভিতরেই সীমাবদ্ধ করা যাক। আমাদের ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের ভিতরে অনেকেই কাব্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমাদের রসাস্বাদ ব্যাপারটিকে সাধারণ মনোরাজ্য হইতে অনেক ঊর্ধ্বের জিনিস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময় যে রস তাহা বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য এবং তাহার বিশুদ্ধ স্বরূপে সে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। অনেকে কাব্যের এই এক এবং অখণ্ড রসের স্বরূপকে ব্রহ্মের স্বরূপের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। এক এবং অখণ্ড ব্রহ্ম যেমন উপাধিভেদে বিভিন্নরূপে পরিকল্পিত হইতেছেন, ঠিক সেইরূপ আনন্দচিন্ময়-স্বরূপ এক এবং

অখণ্ড রস বিভাবাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া সাহিত্যের নানা রসানুভূতির রূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে।

কিন্তু আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই, এক এবং অখণ্ড আনন্দচিন্ময় রস যে পর্যন্ত বিভাবাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া উপাধিযুক্ত না হইতেছে, সে পর্যন্ত সে যে শুধু মনোরাজ্যের বস্তু নয় তাহা নহে,—সে পর্যন্ত সে সাহিত্যেরও বস্তু নয়। আমাদের সর্ববিধ হ্লাদজনক বৃত্তির পশ্চাতে একটি অখণ্ড রসস্বরূপকে স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই অখণ্ড রসস্বরূপটি একটি বিশেষভাবে উপাধি-যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কাব্যরসের রূপ গ্রহণ করে না। আমরা সাধারণতঃ কাব্যানন্দকে আমাদের অন্যান্য সকল আনন্দ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারি কি করিয়া? এই বিশেষ বিশেষ উপাধি দ্বারাই হয় তাহার ভেদ-পরিচয়। বহির্বস্তুর সংস্পর্শে উদ্রিক্ত হইয়া ওঠে আমাদের বিভিন্ন প্রকারের আনন্দানুভূতি; সেই সব বস্তুর প্রকৃতি এবং আমাদের মনের সহিত তাহাদের সংস্পর্শ-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি দ্বারাই নির্ধারিত হয় আমাদের আনন্দাস্বাদের প্রকৃতি। মোটের উপরে দেখিতে পাই, বিশ্বসৃষ্টি তাহার একটি বিশেষ রূপে এবং আমাদের মনের সহিত তাহার একটি বিশেষ পরিচয়-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া আমাদের ভিতরে একটি হ্লাদজনক

বিশেষ চেতনার উদ্বোধ করিতেছে; সেই অখণ্ড আনন্দচিন্ময় স্বরূপের যে একটি উপাধিযুক্ত বিশেষ উদ্বোধ তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ আমাদের কাব্যের রস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এই যে উপাধিযুক্ত রসের বিশেষ স্বরূপ তাহাকে মনোরাজ্যের সীমানার ভিতরে ফেলিয়া বিচার করিতে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে হয় না।

তত্ত্বের দিক হইতে সাহিত্যের বিশুদ্ধ স্বরূপ যাহাই হোক না কেন, আমরা যে সাহিত্য সম্বন্ধে সচরাচর কথা বলি এবং যে সাহিত্যকে লইয়া আমাদের আদর্শবাদ এবং বাস্তববাদের ঝগড়া, তাহা আমাদের মনোরাজ্যেরই বস্তু,—সুতরাং মনোধর্মের আলোচনা তাহার সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। মনের রাজ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই, সেখানে একান্ত-নিরপেক্ষ কোন বোধশক্তি নাই,—সকলেই পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে; যাহাকে আমরা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য বলিয়া ভুল করিতেছি, তাহা সাময়িক এবং আপেক্ষিক প্রাধান্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের মনোরাজ্যটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, সেখানে প্রত্যেকটি বোধ প্রত্যেকটি বোধের সহিত অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত হইয়া আছে; তাই 'আর্টের জন্য আর্ট'

কথাটি মূলতঃই ভুল। আমাদের মনের মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যে, আমাদের রসবোধ বা সৌন্দর্যানুভূতি যখন সম্রাটের বেশে বাহির হয়, তখন অন্য সকল বোধগুলিকে একেবারে নিঃশেষে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য অন্ধকার গারদে পুরিয়া রাখি। রসবোধ যখন রাজার ন্যায় রাজপথে বাহির হয় তখন তাহার আগে পাছে বহু জাতীয় স্ফুট ও অস্ফুট বোধের শোভাযাত্রা চলিতে থাকে ; সেখানকার মন্ত্রী সেনা-পতি এবং সৈন্যসামন্ত সকলের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া, বা সকলকে বিদ্রোহী করিয়া রাজা একেবারে অচল। আসল কথা এই,—আমরা যেখানে আর্টের চর্চা করিতে বসি,—সৃষ্টির ভিতরেই হোক বা আস্বাদনের ভিতরেই হোক, তখন আমাদের রসবোধ বা সৌন্দর্যবোধটিই প্রবল থাকে ; কিন্তু তাই বলিয়া তখনকার জন্য যে আমরা আমাদের ধর্মবোধ, নীতিবোধ, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বোধগুলিকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি তাহা নহে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের এই জাতীয় সূক্ষ্ম এবং উচ্চ বোধগুলি একেবারে মৌলিক নহে ; অথবা আদিতে মৌলিক হইলেও তাহারা সাধারণতঃ একটা জটিলতম যৌগিকরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বোধের বিচিত্র সমাবেশে আমাদের মনের মধ্যে

আপাতস্বতন্ত্র এক একটি বোধ জাগিয়া ওঠে। এইভাবে আমাদের ধর্ম ও নীতিবোধের ভিতরে আমাদের রসবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ ওতঃপ্রোতোভাবে মিশিয়া আছে,—আবার আমাদের রসবোধ এবং সৌন্দর্যানুভূতির ভিতরেও আমাদের ধর্মবোধ, মঙ্গলবোধ প্রভৃতি জীবনের সকল উচ্চতর বোধগুলিই সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া থাকে। ফলে সৌন্দর্যানুভূতির সময়ে আমরা তাহাকে কিছুতেই আমাদের অন্যান্য বোধগুলি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারি না.—তাহা মনস্তত্ত্বের দিক হইতেই অসম্ভব।

পূর্বেই বলিয়াছি. মনোরাজ্যে এই বোধগুলিকে সর্বদাই মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে হয়, তাই সর্বদাই ইহাদের ভিতরে চাই সঙ্গতি। কোনও বিশেষক্ষেত্রে আমাদের নীতিবোধ হয়ত সৌন্দর্যবোধের নিকট মাথা নোয়াইয়া দিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্যবোধ যদি সগর্বে নীতিবোধের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিতে বসে, বা তাহার অস্তিত্বকে কোনও অবমাননার ভিতরে টানিয়া আনে, সেখানে মনোরাজ্যে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। যে দৃশ্য বা ঘটনা সত্যই আমাদের নীতিবোধকে আঘাত করে, সে যে কখনও আমাদের নিকট সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে, এই কথাটাই মূলতঃ মিথ্যা। সৌন্দর্য সম্বন্ধে যেমন এই কথা, নীতিজ্ঞান

সম্বন্ধেও তেমনই একই কথা; অর্থাৎ যে জিনিস সত্য সত্যই আমাদের সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধের একান্ত পরিপন্থী তাহা কখনই আমাদের নিকটে মঙ্গলের উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে না। আমাদের মনটিকে আমরা একটি বীণাযন্ত্রের সহিত তুলনা করিতে পারি। মূলতারেই ধ্বনিয়া ওঠে সঙ্গীত; কিন্তু সেই মূল তারের সহিত অন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারগুলির যদি একটি সুসঙ্গতি না থাকে, তবে মূলতারের সুর বিচিত্র ঝঙ্কারে মনোরাজ্যকে ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে না,—মন জুড়িয়া জাগিয়া থাকে শুধু একটা অসঙ্গতির বেদনা।

সুতরাং দেখিতেছি, সর্বক্ষেত্রেই মনের বৃত্তিগুলির ভিতরে একটা সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য একান্তই প্রয়োজন, নতুবা মনের মধ্যে একটা বেসুরের বেদনা আমাদের কোন বোধকেই সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট হইতে দেয় না। আর্টের ক্ষেত্রেও নীতির সহিত চাই একটি সূক্ষ্ম সঙ্গতি,—নতুবা অসঙ্গতির বেদনা লইয়া সে সুন্দর হইয়া উঠিতেই পারে না। আমরা আজ-কাল যেখানে আর্ট ও নীতিজ্ঞানকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছি, এবং বাস্তব কলুষ এবং বীভৎসতাকেও আর্টের মোহিনী-স্পর্শে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিতেছি, সেখানকার প্রকৃত সত্যটি এই যে, আর্ট সেখানে আমাদের বর্তমান নীতিজ্ঞানের

সহিত সঙ্গতি লাভ করিয়াছে, এবং এই জন্যই সে আমাদের নিকট সুন্দর। পতিতালয়ের কাহিনী দিয়া আমরা যেখানে আর্টের আসর জমাইয়া তুলিতেছি, সেখানে বুঝিতে হইবে পতিতার জীবন সম্বন্ধেই আমাদের পূর্ব ধারণা অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে; পতিতা সেখানে ঘৃণ্য, কদর্য হইয়া ওঠে নাই,—সে আমাদের কৃপার পাত্র, আন্তরিক সহানুভূতির আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে; এবং এই জন্যই তাহার জীবন আমাদের আর্টেও সুন্দর হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্যে যে আজকাল সমাজের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের অভিযান তাহা যে নিতান্তই আর্টের খাতিরে তাহা নহে, তাহার পশ্চাতে আছে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ। কোন দৃশ্য বা ঘটনা যদি আমাদের নিকটে সত্য সত্যই বাস্তবে জঘন্য বা বীভৎস হইয়া উঠিয়া থাকে, তবে আর্টের গঙ্গাজল ছিটাইয়াই তাহাকে সুন্দরের কোঠায় পৌঁছাইয়া দিতে পারি না। তাই মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের আর্ট সম্বন্ধে যে মতবাদের অমিল তাহার কারণ অনেকখানি রহিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের নীতিবোধ এবং আধুনিক যুগের নীতিবোধের সহিত বৈষম্যে। শরৎচন্দ্রের নীতিবোধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবোধ যদি একই থাকিত তবে 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের নিকটেই সুন্দর হইয়া উঠিতে পারিত না।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন সর্বদাই সাম্যের গান গাহিয়া গিয়াছেন, আর্টের ক্ষেত্রেও তিনি সেই সাম্য-বাদের প্রচারক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আর্ট হইতে নীতিজ্ঞানকে বা নীতিজ্ঞান হইতে আর্টকে কখনই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না,—তাই উভয়েরই স্ফুরণের জন্য এবং পূর্ণ-পরিণতির জন্য উভয়ের ভিতরে চাই সঙ্গতি। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে, সৌন্দর্যবোধের ভিতরে যে নীতিজ্ঞান তাহাকে থাকিতে হইবে যবনিকার অন্তরালে; কিন্তু সৌন্দর্যবোধের ভিতরে সেই নীতিজ্ঞানই যদি প্রধান হইয়া ওঠে এবং নীতিজ্ঞানের দ্বারাই যদি আর্ট মুখ্যতঃ পরিচালিত হয়, তবে সেখানে যে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুন্দরই সত্য এবং শিব হইতে প্রধান; সাহিত্যে যেখানে ইহার ব্যত্যয় ঘটে সেখানেই তাহার বিরুদ্ধে আইনত অভিযোগ আনিতে পারা যায়। আর্টের ক্ষেত্রে আদর্শবাদের একটা সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিলে আর্ট অব্যাহত থাকিতে পারে না। রসজ্ঞ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র এ-জিনিসটি জানিতেন এবং তিনি নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে নীতি এবং ধর্মের আধিপত্য আর্টের ক্ষেত্রে ক্রমেই অসঙ্গত হইয়া উঠিতেছে। এই জন্যই

'সীতারাম' রচনার পরেও কয়েক বৎসর কাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেও তিনি আর কখনও নূতন করিয়া উপন্যাস সৃষ্টিকার্যে হাত দেন নাই।) সুতরাং আর্টের ক্ষেত্রে আদর্শবাদের স্থান দেওয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যে অ-রসিকের কাজ হইয়াছে একথা বলা না ; আর্টের ক্ষেত্রে আদর্শবাদকেই যেখানে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে সেখানেই আমাদের সত্যকার অভিযোগ।

(সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকস্থলেই শাসক এবং প্রচারকের রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রচার কার্যের দ্বারা—সাহিত্যের এই উদ্দেশ্যমূলক নীতিদ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের আর্ট কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বা না হইয়াছে, সে বিচারে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হইব না। বর্তমানে বিচার্য এই, আর্টের সহিত প্রচারকার্যের সম্পর্ক কতখানি, এবং ইহার সীমাই বা কোন্‌খানে।) এখানে (তথা-কথিত বাস্তববাদীরা বলিবেন, আর্টের ক্ষেত্রে প্রচারের প্রবেশ একান্তই অনভিপ্রেত অনধিকার প্রবেশ। সংসারে কি ভালমন্দ তাহা বুঝাইয়া সৎপথে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে, সাহিত্যকেও ইহাদের প্রচার কার্যে নিযুক্ত করিয়া লাভ কি? কিন্তু আর্ট-সৃষ্টির ব্যাপারটিকে একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে

পাইব, এখানকার যে ভুল তাহাও মূলের ভুল। বাস্তববাদ কথাটিতে যে সত্য কি বুঝায় তাহা বুঝিয়া উঠাই ভার। বাস্তববাদ বলিতে যদি আমরা ইহাই বুঝি যে, সাহিত্যের কাজ হইতেছে বাহিরের বস্তুকেই একেবারে যথাযথ আনিয়া অক্ষরের মারফতে সকলের সম্মুখে ধরা, তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, সে কাজটি একটি জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা একখানি ফোটোগ্রাফের প্লেটই সবচেয়ে বেশী নিখুঁত ভাবে করিতে পারে; তবে আর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য একটা বিরাট্ জীবন্ত প্রতিভার প্রয়োজন কোথায়? নিজের মনের রঙ তাঁহার সৃষ্টির ভিতরে মাখিয়া দেওয়া যদি সাহিত্যিকের একটা দুরপনেয় কলঙ্ক হয়, তবে আর্ট বস্তুটিই যে দাঁড়াইতে পারে না; কারণ (আর্টের যে সত্য সে শিল্প-স্রষ্টার মনোরাজ্যের সত্য,—এবং সাহিত্যের মাপকাঠিতে এই মনোরাজ্যের সত্যটিই বাস্তব সত্য হইতে অনেক বড়।)

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর্টের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকেও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। সৃষ্টির পূর্বে আমাদের অন্তরে জাগে কোন বস্তুর অবলম্বনে একটি তীব্র ভাবাবেগ। এই ভাব-সম্বেগের ভিতরে আমাদের আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাবের বাস্তব-সত্তাটিই যে একটি প্রকাণ্ড জিনিস তাহা নহে; বহিঃপ্রকৃতি হইতে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মূল্য এখানে

কম নহে। বহির্বস্তু একটি অবলম্বন মাত্র,—তাহাকে কোনও একটি ভাবরূপ দেয় আমাদের অন্তর। এই 'অন্তঃ-করণে'র দ্বারা বহির্বস্তুকে যদি আমরা ভালরূপে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে না পারি, তবে শুধু বহির্বস্তুর স্তূপীকরণে কোনও সাহিত্য গড়িয়া ওঠে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বহির্বস্তুকে আমরা আর্টের আলম্বনরূপে যখন অন্তরে ধারণ করি, তখনই আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি দ্বারা তাহাকে একটি নবীন ভাবময় রূপ দান করিয়া লই; এ-রূপটি সাহিত্যিকের নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুর এই আন্তর সত্তাকে আমরা যখনই আবার বাহিরে রূপায়িত করিয়া তুলি, তখনই তাহার সহিত আমাদের সকল ভালমন্দবোধ মিশিয়া যাইতে বাধ্য।

মোটকথা আমরা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করি তখন সেই শিল্পসৃষ্টির ভিতরেই আমাদের নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া থাকে। অল্পের ভিতরে হয়ত তাহাকে ধরা যায় না—কিন্তু আর্টসৃষ্টির ক্ষেত্র একটু প্রসার লাভ করিলেই এ জিনিসটি পরিষ্কাররূপে ধরা পড়ে। বাঙলা-সাহিত্যে নিপুণ বাস্তববাদী বলিতে এক সময়ে সাধারণতঃ শরৎচন্দ্রকেই মনে করা হইত। এই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে আমরা কি পাইয়াছি? শুধু কি নিরালম্ব আর্টের মাধুর্য? জীবনের ভালমন্দ সম্বন্ধে কি তিনি কোন কথাই বলেন নাই?

তাঁহার সাবিত্রী-সতীশ, বিজয়া-নরেন, রমা-রমেশ, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত প্রভৃতি সকলেই কি শুধু বাস্তবের ফটোগ্রাফ? আজ যে শরৎচন্দ্র নবীন বাঙলার চিত্ত জয় করিয়া বসিয়া আছেন, সে কোন্ গুণে? শুধু কি আর্টসৃষ্টির জন্য? সেই আর্টের মধুর রসে সিক্ত করিয়া মানুষের জীবনের নীতি সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে অনেক কথা শুনাইয়াছেন,—অনেক কথা বুঝাইয়াছেন,—মানুষের জীবনের প্রতি তিনি আমাদের একটি নূতন অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন। ইহাই ত নীতি শিক্ষা;—'সদা সত্য কথা কহিবে' এই নীতিশিক্ষা অপেক্ষা জীবনের মূল নীতির পরিবর্তন—তাহার গভীর গহনে আলোকপাত এবং সত্যের আবিষ্কার ইহা যে আরও গভীর নীতিশিক্ষা। সাহিত্যের মারফতে এই নীতিশিক্ষা—এই প্রচারকার্যকে আমরা শুধু যে কোনও রূপে নাক মুখ বুজিয়া বরদাস্তই করিয়া গিয়াছি তাহা নহে,—আমরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সাদর অভিনন্দনে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। তাই শরৎচন্দ্র আজ আমাদের নিকটে শুধু নিপুণ কলাবিদ্ রূপে পূজ্য নন,—তিনি সংস্কারকরূপেও আমাদের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই,—শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যত সাহিত্যিক সমালোচনাই হইয়াছে, সেখানে তাঁহার আর্টের সহিত তাঁহার সমাজসংস্কারের কথা

ওতঃপ্রোতোভাবে মিশিয়া আছে,—আর্ট এবং নীতি সেখানে হরিহরাত্মা।)

(প্রত্যেক বড় সাহিত্যিকের জীবন-সম্বন্ধে একটি নিজস্ব দর্শন আছে। ইহার কতকখানি তাঁহার আন্তর ধাতুর মধ্যেই অনুস্যূত, কতকখানি তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ। জীবন-সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টি ব্যতীত, কখনও আর্টসৃষ্টি হইতে পারে না,—আর জীবনের এই ভাবদৃষ্টির ভিতরেই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মিশিয়া থাকে আমাদের শ্রেয়োবোধের অসংখ্য আলোকচ্ছটা। এই ভাবেই আমাদের সৌন্দর্যবোধ আমাদের প্রেয়বোধ এবং শ্রেয়োবোধের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে; আমরা বাহির হইতে তাহাদের ভিতরে যে অহি-নকুলের সম্পর্ক স্থাপন করিতেছি উহা অনেকখানিই কাল্পনিক।)

কিন্তু সমস্যা এই, আর্টের ভিতরে এই নীতি-প্রচারের স্থান কতটুকু এবং তাহার সীমা কোথায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, (ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের লক্ষণের ভিতরে সর্বদাই 'উদ্দেশ্য'কে স্বীকার করিয়াছেন এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিক গ্রন্থে কোন কোন স্থলে সাহিত্যের ফল-শ্রুতির ভিতরে চতুর্বর্গ লাভের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের ভিতরে এই 'উদ্দেশ্যে'র স্থান কোথায় এবং কতটুকু

সে সম্বন্ধে 'কাব্য-প্রকাশ'কার মম্মট ভট্ট একটি অতি গভীর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—সাহিত্যের ভিতরে যে উপদেশ থাকিবে তাহা 'কান্তাসম্মিত',—'কান্তাসম্মিতয়োপদেশযুজে'। স্বামি-সোহাগিনী নারী যেমন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য এবং প্রেম-মাধুর্য দ্বারাই স্বামীর চিত্তকে জয় করিয়া লয় এবং প্রেমবশবর্তী স্বামীকে তাঁহার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নিজের অভিপ্রায়মুখী করিয়া তোলে, আর্টও তেমনি তাহার সৌন্দর্য ও রস-মাধুর্যের দ্বারাই আমাদের চিত্ত জয় করিয়া জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমাদিগকে মঙ্গলের পথে চালিত করিবে। এই প্রসঙ্গে 'কাব্য-প্রকাশে'র টীকায় শব্দকে ত্রিবিধ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা, প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত এবং কান্তাসম্মিত। প্রভুসম্মিত বাক্য প্রভুর ন্যায় দণ্ড ধরিয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথে চালিত করে; যেমন, বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি। তারপর সুহৃদ্ যেমন কোনও কর্তব্যের আদেশ দেয় না, শুধু বলিয়া দেয়, ইহা করিলে মঙ্গল হয়,—আর ইহা করিলে অমঙ্গল হয়, ইতিহাস পুরাণাদিও তেমনই সুহৃৎসম্মিত বাক্যের বক্তা; কিন্তু কি করিলে ভাল হয়, কি করিলে মন্দ হয় সুহৃদের মতন স্পষ্ট করিয়া সে কথাও সাহিত্য বলিবে না। সাহিত্য শুধু যাহা মঙ্গলের তাহাকে তাহার অন্তরের গভীর প্রদেশে লুকাইয়া রাখিবে; তাহার প্রিয়তম পাঠককে

তাহা পূর্বাহ্নে জানিতেও দিবে না; শুধু সৌন্দর্য এবং রসের ভিতর দিয়া—শুধু তাহার লোকোত্তর রমণীয়তার ভিতর দিয়া পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া লইয়া মনের অজ্ঞাতসারে তাহাকে মঙ্গলের আলোকে লইয়া চলিবে।

এখানে কথা উঠিতে পারে, এই সৌন্দর্য এবং রস-মাধুর্য দ্বারা সাহিত্য আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে কেন,—সৌন্দর্য এবং রস-মাধুর্যকেই কি সাহিত্যের পরম সার্থকতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না? নতুবা সাহিত্যের ভিতরে সৌন্দর্য এবং রস-মাধুর্য যেন অনেকখানিই গৌণ হইয়া যায়, তাহারা যেন আপনাতে আপনারা কিছুই নহে,—একটা মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বরূপেই যেন তাহাদের সকল মূল্য। এ-কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই যে আমাদের মনের মধ্যে শ্রেয়োবোধ—ইহা যদি চিরাচরিত সংস্কার মাত্র না হইয়া আমাদের অন্তরের ভূমিতে অন্তরের আলো-সম্ভার লইয়া ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তবে সে আমাদের সকল বোধের ভিতরে শ্রেষ্ঠ, এবং আমাদের সকল মানসিক বৃত্তির বিকাশের ভিতরে সে তাহার ছাপ রাখিয়া দিবেই। এ-কথার আভাস আমি পূর্বেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আজকাল আমরা আমাদের যে সকল সাহিত্য-সৃষ্টিকে এই মঙ্গলবোধের বালাই হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে

আপন গৌরবেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছি, একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে সেখানেও আমাদের শ্রেয়োবোধ লুপ্ত হয় নাই, সকল আর্টসৃষ্টি জড়াইয়া একটা কিছু কথা বলা হইয়াছে,—এবং সেই কথাটির ভিতরেই সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া আছে আমাদের শ্রেয়োবোধ। তবে আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের শ্রেয়োবোধটি কোনও একটি চিরন্তন স্থবির পদার্থ নহে; কালের পক্ষ বিস্তার করিয়া সেও মানুষের জীবন ধারার সহিতই ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নিরন্তর পরিবর্তনের ভিতরে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সম্বন্ধেই আমাদের শ্রেয়োবোধ হয়ত প্রায় সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। বাল্মীকির এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া হয়ত বুঝিয়াছিলাম,—'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ'; মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' পড়িয়া হয়ত বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে,—'রাবণাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রামাদিবৎ';—কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য হইতে যে শ্রেয়োবোধ লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহা নহে। বস্তুতঃ আজকাল আমাদের সাহিত্য-রচনায় প্রচলিত সমাজ ও নীতির বিরুদ্ধে আমরা সচরাচর যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকি তাহা যে শুধু আর্টের মুখ চাহিয়াই তাহা নহে,—তাহার পশ্চাতেও রহিয়াছে অনেকখানি আমাদের

শ্রেয়োবোধের তাগিদ। প্রচলিত মঙ্গলের আদর্শ হইতে আমাদের 'অত্যাধুনিক' মঙ্গলের আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক্, এবং তাহা পৃথক্ বলিয়াই আমরা সাহিত্যের মারফতে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমাদের সেই নব্য শ্রেয়োবোধটিকে পাঠক সমাজে পেশ করিতেছি। ইহার ভিতরে আমাদের চিরাচরিত সংস্কারে যেখানে আঘাত লাগিয়া অশ্লীলতা দোষ উৎপন্ন হইতেছে, আধুনিকতাবাদীদের শ্রেয়োবোধের নিকট তাহা সত্যকার অশ্লীলতাদোষদুষ্ট নহে ; অথচ এই সরল সত্যটিকেই আমরা চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছি আর্টের নানা কৈবল্য-রূপের লক্ষণ ফাঁদিয়া। মজার কথা এই,—একদিকে আমরা আমাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিপীড়িত দুর্বলের বুকের অস্ফুট বেদনাকে ভাষা দিতেছি,—মানুষের মনের গহনের দুর্জ্ঞেয়ত্বের ভিতরে আলোকপাত করিতেছি, মুটে-মজুর এবং অসংখ্য কল-কারখানার শ্রমিকরূপ 'ভুখা-ভগবান'দের জয়গান করিতেছি, এবং ইহা লইয়াই বর্তমান যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাইতেছি,—অন্যদিকে আবার প্রমাণ করিতে লাগিয়া গিয়াছি যে, সাহিত্যের রসবোধের সহিত আমাদের শ্রেয়োবোধের কোনই সম্পর্ক নাই !

আমার মনে হয়, সাহিত্যকে যে আমরা ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতিগত সকল শ্রেয়োবোধ হইতে দূরে রাখিয়া

একটি নিরালম্ব রস-আলাপনের ভিতরেই পর্যবসিত করিতে বসিয়াছি, উহা আমাদের চিন্তার সঙ্কীর্ণতা। ধর্ম-গৃহের ভিতরে যিনি আমাদের সৌন্দর্যবোধকে কিছুতেই ঢুকিতে দিতে নারাজ তিনিও যেমন গোঁড়া সঙ্কীর্ণ, সাহিত্যে যিনি ধর্ম বা নীতিকে স্থান দিতে নারাজ তিনিও তাহা হইতে কোন অংশে কম গোঁড়া বা সঙ্কীর্ণ নহেন। তবে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ধর্মবুদ্ধিতে বা নীতিবুদ্ধিতে অবশ্যই পার্থক্য থাকিতে পারে ; একে যেখানে হাজার হাজার নিরন্নকে উপেক্ষা করিয়া দেব-পূজনের ভিতরেই ধর্ম লাভ করিয়াছেন, অপরে হয়ত যেখানে ভজন-পূজন ছাড়িয়া প্রেমের ভিতরে—সর্বজনীন সহানুভূতির ভিতরেই ধর্ম লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু ধর্ম বা নীতি সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা আর্টের সহিত আমাদের এই জাতীয় সকল বোধগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে কখনই অস্বীকার করিতে পারে না। সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মনোভাবটি আরও উদার আরও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক ; জীবনের একটা গভীর ব্যাপ্তি—একটা বিরাট পরিধির ভিতরে দেখিতে পাইব, আর্ট ও মঙ্গলবোধ কত নিকট-সূত্রে আবদ্ধ! বঙ্কিমচন্দ্রের মনে এই বিরাটত্ব এই প্রসার ছিল, তাই তিনি সুন্দরকে কোনদিনই মঙ্গল হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারেন নাই।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ভারতীয় চিন্তাধারায় সুন্দরকে কখনও সত্য ও শিব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা হয় নাই; তাহার কারণ জীবনের ক্ষেত্রে প্রাচীন মনীষিগণের একটা গভীর সমন্বয়বোধ। আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষকে চতুর্বর্গ বলা হইয়াছে, এবং এই চতুর্বর্গ-লাভকেই তাঁহারা জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের বর্তমান চিন্তায় ধর্ম ও মোক্ষের আদর্শের সহিত অর্থ ও কামের কোন সম্বন্ধই রচনা করিতে পারি না,—তাহারা যেন একান্তই পরস্পরবিরোধী। এই জন্যই আমাদের কামনার জগৎ এবং অর্থের জগৎকেই স্বীকার করিতে গিয়া ধর্ম এবং মোক্ষের জগৎকে আজ বাধ্য হইয়া অস্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু প্রাচীনেরা বলিতেন, ধর্ম এবং মোক্ষের সহিত অবিরোধে যে অর্থ ও কামের ভোগ তাহাতেই যথার্থ পুরুষার্থ। জীবনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই গভীর সমন্বয়বোধকে যেখানেই হারাইয়া ফেলি, সেইখানেই দেখা দেয় সত্যকারের বিরোধ। আমরা যেখানে 'আর্টের জন্য আর্ট' এই মতবাদকে একটা সর্বজনীন এবং সর্বকালিক সত্যরূপে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই, সেইখানেই আমরা উপেক্ষা করি জীবনের গভীর সমন্বয়কে এবং সেখানকার আমাদের

মতবাদটির অর্থ গিয়া দাঁড়ায় এই যে, আর্টই যেন জীবনের যথা-সর্বস্ব। কিন্তু রূপদক্ষ যদি তাঁহার শিল্পবোধের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে গিয়া আর্টকেই জীবনের পরমার্থ বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন, তবে নীতিবিদ্, অর্থনীতিবিদ্, রাজনীতিবিদ্, ধর্মনীতিবিদ্গণই বা ছাড়িয়া কথা বলিবেন কেন?—তাঁহারাও যে যাহার উপাসক তাহাকেই পরমার্থ বলিয়া প্রচার করিবেন,—এবং এইখানেই সম্ভাবনা সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের। কিন্তু জীবনের বৃহত্তর পরিধি এবং আবর্তনের ভিতরে দেখিতে পাইব,—জীবনের ক্ষেত্রে আমরা কাহাকেও অস্বীকার করিতে পারি না, উপেক্ষা করিতে পারি না। তখনই আসিবে আমাদের অবিরোধদৃষ্টি, সেই অবিরোধদৃষ্টিই আমাদের জীবনের সত্যদৃষ্টি।

—শেষ—